পর্ব : ১

মুখবন্ধের অভিমুখ

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য : পাঠের ভূমিকা

দীপঙ্কর মল্লিক

‖ আলোচনার অভিমুখ ‖

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয়
টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, বাংলার ব্রত ও পার্বণ

১.

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয়

সমমনোভাবাপন্ন মানুষের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামূহিক কৃতি হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বহু মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখে এবং এমন বোধে একত্রিত করে যেখানে অতি সহজেই মূল্যায়ন করা চলে একটি জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা কতখানি স্বতন্ত্র। হারস্কোভিট্স মনে করেন, 'Culture is the man-made part of the environment.'[১] একই ঐতিহ্য ও আত্মবোধে লালিত সেই জাতি, যাদের জীবনধারণের মধ্যে রয়েছে 'general attitude', 'view of life' এবং 'specific manifestation of civilization' যা কিনা 'give a particular people its distinctive place in the world', তারাই নিজস্ব জাতিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির স্রষ্টা। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এজন্যে 'জাতিস্বভাব', 'জাতিচরিত্র', 'আত্মবোধ'-এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক খানি।[২] প্রসঙ্গক্রমে ক্লাইভ ক্লাক্হোন-এর মন্তব্য স্মরণীয়, যেখানে তিনি বলেছেন 'to be human is to be culture.'[৩]

➲ সংস্কৃতি 'মনের কৃষি'

লোকসংস্কৃতির স্বরূপ-সন্ধানের পূর্বে 'সংস্কৃতি' নামক সভ্যতা-বৃক্ষের পুষ্পিত শাখাটিতে নানা বিরোধী বক্তব্যের বাইরে দাঁড়িয়ে খোলা চোখে দেখে নেওয়া যেতে পারে। সেই আলোচনায় প্রথমে বলে নেওয়া ভালো, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সংযোগ থাকলেও এরা কোনো অর্থেই সমার্থক নয়। সভ্যতা যেখানে 'Organisation of life,' সংস্কৃতি সেখানে 'Expression of life' ইংরেজি 'Culture'-এর আভিধানিক অর্থ 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি', 'সভ্যতা' কে বোঝালেও এই তিনটি শব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল সংস্কৃতিকে। 'কৃষ্টি'র বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ছিল শব্দটি 'কুশ্রী' এবং তা একই সঙ্গে 'তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাংলা ভাষার পায়ে বিঁধেছে।' তাছাড়া 'কৃষ্টি' শব্দটি 'ইংরেজি শব্দের পায়ের মাপে বানানো। এতটা প্রণতি ভালো লাগে না।' বরং 'সংস্কৃতি'র একটি 'Linguistic aesthetics' আছে। যেকারণে

'সংস্কৃতি' থেকে 'সাংস্কৃতিক' বেশ লাগে, কিন্তু কোনক্রমেই চলে না 'কৃষ্টি' থেকে 'ক্রৈষ্টিক'। 'কৃষ্টি'র ওপরে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তিবোধ থাকলেও সানন্দ সমর্থন ছিল 'সংস্কৃতি' শব্দটির ওপরে।

সমাজ-দেহে বসবাসকারী ঐতিহ্যাশ্রয়ী মানুষের মার্জিত রুচি, অর্জিত জ্ঞান, রীতি-নীতি, প্রথা, নৈতিকতা—এই সবকিছু নিয়ে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষকে একত্রিত করে, স্বতন্ত্র করে এবং জড়ত্বমুক্ত করে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহজ-সুন্দর অনুধ্যানে ধরা পড়েছে সংস্কৃতির রূপ। তিনি লিখেছেন—"একাধারে সভ্যতা তরুর পুষ্প তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা তা হচ্ছে Culture."[৪]

বস্তুত, সংস্কৃতি হলো একটি জাতির চিন্তা-চেতনা ও মননের সামগ্রিক প্রতিফলন এবং জীবনচর্যার অখণ্ড চিত্রণ। ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রীতি-নীতি, আচার-প্রথার সামগ্রিক প্রতিফলিত রূপ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সত্য পরিচয় কোথায় এবং কিভাবেই বা বহমান থাকে, তার চরিত্র নির্ণয়ে লিখেছেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

> বংশধারা সংক্রামিত দোষগুণের ন্যায়, রক্তকণা বাহিত শক্তি দুর্বলতার ন্যায়, সমগ্র জাতির অতীত জীবন সাধনা হইতে প্রাপ্ত এ মানস বৈশিষ্ট্য আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি রচনা করে। অন্তরের এই গোপন স্তরশায়ী প্রবণতা, ঐতিহ্য হইতে আগত মনোলোকের এই প্রচ্ছন্ন জীবনশক্তিই সংস্কৃতির সত্য পরিচয়।[৫]

'আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি' এবং 'প্রচ্ছন্ন জীবনশক্তি' যা আমাদের অস্তিত্বকে বহু যুগ-যুগান্তরের পরেও স্মরণে রাখার মতো স্পর্ধা দান করে; সেই প্রাণবন্ত 'মানস বৈশিষ্ট্য' হলো 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতি মানুষকে ছন্দোময় করে, মার্জিত করে। এই অর্থে 'Culture' অর্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্তোৎকর্ষ' শব্দটিও ব্যবহার করেন।[৬] কৃষিজমি পতিত রাখলে একসময় তা সবুজ-সন্তান ধারণে অক্ষম হয়; 'মনের কৃষি' বা 'মানব-জমিন' সংস্কার বা পরিমার্জনা ব্যতীত তা কখনই উৎকর্ষ লাভ করে না। সংস্কৃতি তাই শরীর সম্পর্কিত বিষয় ততটা নয়, যতটা মন সম্পর্কিত বিষয়। 'রাশিয়ার চিঠি'র ছয় সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ মনের সংস্কার সাধনকারী সংস্কৃতিকে বলেছেন 'মনের কৃষি'। সংশয়ীকালে বসে শাক্ত সাধক-কবি রামপ্রসাদ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এই 'মনের কৃষি' কেই 'আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।' আমরা জানি যে, বিরাট বিস্তৃতি নিয়ে যে সংস্কৃতি তার ত্রিমূর্তি বিভাজন লক্ষণীয়। যথা—

১. নগরসংস্কৃতি : যার স্রষ্টা নগরসভ্যতা। নগরায়ন যার মূলে।
২. লোকসংস্কৃতি : যার স্রষ্টা বৃহত্তম লোকসমাজ। 'লোক' নামে বৃহত্তর গণজীবন যার অনুপ্রেরণা।
৩. আদিমসংস্কৃতি : যার স্রষ্টা উপজাতি সমাজ।

লোকসংস্কৃতি এই নগর সংস্কৃতি ও আদিম সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সচল ও প্রাণবন্ত সত্তা। উভয় সংস্কৃতির সংযোগ-সেতু রক্ষার দায়-দায়িত্ব তার। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, স্বভাবে ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে লোকসংস্কৃতি অন্তর্দেশীয় বা National, তাই এর সঙ্গে মাটির যোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। সংস্কৃতির আপাত ত্রিবিধ বিভাজনের মধ্যে এই শাখাটি তাই এককথায় দেশজ। প্রাণের স্পন্দন এর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে অনুভববেদ্য।

লোকসংস্কৃতি মূলত প্রাকৃত জীবনের সামগ্রিক জীবনচর্যা ও মানসচর্চার মার্জিত রূপায়ণ। লোকায়ত বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে এর মধ্যে। এখানে থাকে দেশজ, লৌকিক, প্রাকৃত উপাদান। দেশজ সংস্কৃতিকে তাই এই অর্থে লোকসংস্কৃতি বলা হয়। বস্তুত মহৎ সৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা হলো লোকসংস্কৃতি। অভিজাত সংস্কৃতির বিপরীত মেরুবাসী এই লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকসমাজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভয়-ভীতি, রুচি-অরুচি, ধর্ম-সংস্কার, জীবন-অভিজ্ঞতা তথা জীবন-যাপনের বিস্তৃত বিবরণ থাকে। এদিক থেকে 'লোক' নামে চিহ্নিত বৃহত্তর জনসমষ্টির সংস্কৃতি হলো লোকসংস্কৃতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'লোকসংস্কৃতি' হলো বহুবিস্তৃত, দিকদিগন্তপ্রসারী ও চলমান সংস্কৃতি। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের অতীত ইতিহাস, বর্তমান কর্মধারা ও আগামী জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত বলয়ে নিহিত থাকে। আপাত বিচারে অভিজ্ঞানপ্রসূত ও অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও লোককথা, অলংকার বর্জিত ছড়া ও ধাঁধা, বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যানধর্মী গীতিকা, কৃষি সম্পর্কিত লৌকিক ক্রিয়া-কর্মাদি, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক সংস্কার ইত্যাদির মধ্যে লোকসমাজের পৃথক অথচ প্রাণচঞ্চল অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রজন্ম পরম্পরায় লোকসমাজের অন্তঃপ্রেরণা ও ঐতিহ্যানুসারে লোকসংস্কৃতি নদীর স্রোতের মতো বহমান থাকে। নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্তের লৌকিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত লোকই লোকসংস্কৃতি নামক বিরাট-বিস্তৃত স্বতন্ত্রময় সংস্কৃতির স্রষ্টা। 'লোকহিত' প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা রাখেন—"চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।"

এখন তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে জেনে নিতে হয়, এই 'লোক' কারা, কী তাদের পরিচয়, কীভাবেই বা যুগ-পরম্পরায় লোকায়ত দর্শনে বিশ্বাসী এ সব লোক প্রবহমান সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে থাকে। এই আলোচনাকালে মিলিয়ে নিতে হয় 'লোকসমাজ' বলতে আমরা কোন্ স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করি ইত্যাদি বিষয়গুলি। বলাবাহুল্য, আমাদের এই পর্যালোচনায় আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিজ্ঞতাকেও মিলিয়ে নেব।

বিবাদ-বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, লোকসংস্কৃতির দেহ ও আত্মা সন্ধানে লক্ষ করা যাবে জীবনঘনিষ্ঠতা। এই জীবনঘনিষ্ঠতা বা মৃত্তিকাসম্পৃক্ততার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির নিজস্ব জীবনসাধনার মধ্যে। মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকের কল্পনা এবং আত্মায় বিশ্বাস, পূর্বপুরুষের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও পূজা, কৃষি সম্পর্কিত লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতপালন এবং নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষপূজা এসব লোকসমাজের ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

বহু প্রাচীনকাল থেকে লিঙ্গপুজো, ঘটপুজো, চড়ক, গাজন ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে লোকসংস্কৃতির পরিধিকে বিস্তৃতি দান করেছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে এয়োতীদের মধ্যে পারস্পরিক সিঁদুর বিনিময়, নব পরিণীতার হাতে নোয়া পরা, শঙ্খ পরিধান করা, উলুধ্বনি দেওয়া, মাঙ্গলিক আলপনা অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়গুলি দেশজ সংস্কৃতির পরিচায়ক।

লোকসমাজের প্রচলিত বিশ্বাসের সূত্র ধরে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও তন্ত্রের ব্যবহার, 'টোটেম'-এর প্রতি অন্ধ ভক্তি-শ্রদ্ধা, ওঝার প্রতি সুগভীর বিশ্বাস, ভূত-প্রেত-জীন-পরীর প্রতি ভয়-ভীতি নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির লৌকিক দিকের প্রমাণ হিসেবে বহন করে। আমরা দেখেছি যে, আনুষ্ঠানিক কর্মে ব্যবহৃত ঘট, সরা, মালসা, কলাগাছ, সুপারি, পান, ধান, দূর্বা, শিসযুক্ত

নারকেল, আম্রপল্লব, গোময় ইত্যাদি প্রাক্-আর্য নিয়মনিষ্ঠা, পূজা-পার্বণের রীতি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে।

ষষ্ঠীপুজো, শীতলাপুজো, চণ্ডীপুজো, ধর্মঠাকুরের কাছে মানত, শুভ-অশুভ বিচার, অরন্ধন, অম্বুবাচী কিংবা ধ্বজাপূজা এ সবই অনার্য জাতির কাছ থেকে গৃহীত। খাদ্যাখাদ্য বিচার, বাঙালির লৌকিকজীবনে জ্যোতিষীর বিচার, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে গ্রহ-তিথি-বার-গণ বিচার, শাস্ত্রবহির্ভূত স্ত্রী-আচার পালন, কালরাত্রি পালন, ছাদনাতলায় পালিত অনুষ্ঠানসমূহ লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। লৌকিকজীবনের সামূহিক কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়।

➲ লোকসংস্কৃতি ও অভিজাত সংস্কৃতির পার্থক্য

যতই আর্যরা তাদের সংস্কৃতির গর্ব করুন না কেন, এদেশে অনার্যদের কাছ থেকেই তারা সব থেকে বেশি গ্রহণ করেছেন। লৌকিক জীবনচর্চার নানা প্রয়োগমূলক দিক প্রাচীন জনজাতি সমাজ থেকে প্রাপ্ত এবং স্বীকার্য যে, প্রাচীন বাংলার জনজাতি ছাড়াও মাঝি, মাল্লার, হাড়ি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি নিম্নবর্গের লোকজীবনের সংস্পর্শে এসে আর্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীরা বহু তথ্য লাভ করেছেন।

লোকসমাজের প্রাত্যহিক দিন চর্চায়, তাদের আচার-অনুষ্ঠানে, জীবন-যাপনে, উৎসব-অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীর যে আনুগত্য, আঞ্চলিকতা বোধ, নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ থাকে সেগুলি অভিজাত সংস্কৃতির মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলার আদিম অধিবাসিরা ছিলেন অস্ট্রিকভাষীর মানুষ। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা প্রাক্-দ্রাবিড় শ্রেণিভুক্ত। প্রাচীন সাহিত্যে এঁরা চিহ্নিত হয়েছিলেন 'নিষাদ' রূপে। সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা প্রভৃতি জনজাতির মানুষ 'বেদ' গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছিলেন অসুর রূপে। এরা কৌমভিত্তিক জীবনযাপন করতেন এবং নানা 'টোটেম' ও 'ট্যাবু'তে বিশ্বাস করতেন। বাঙালি ধর্মীয় সাধনা ও লৌকিক জীবনের প্রচলিত আচার-বিচারের অনেকটাই এদের থেকে পাওয়া। বাংলা সংস্কৃতির মূল উৎস সন্ধানে এগিয়ে গেলে দেখা যায়, লৌকিক ধর্ম ও জীবনচর্যার সবটুকু আমরা প্রাগার্য মানুষের থেকে পাওয়া গিয়েছে। লৌকিক দেবতার থানে 'হত্যে' দেওয়া বা 'মানত' করার বিষয়টি অভিজাত সংস্কৃতির মানুষজন ভাবতেই পারে না; বৃক্ষের সঙ্গে লোকায়ত মানুষের গভীর সংযোগ রয়েছে। অশ্বত্থ, বট, কলা, দূর্বা, তুলসী, বেল, সিজ, ধান—এগুলি শুধুমাত্র কাজের গাছ নয়, বৃহৎবঙ্গ এসব বৃক্ষের মধ্যে দেখেছে দেবতার নানা খেলা। বিশেষ করে ব্রতের সঙ্গে সম্পৃক্ত পার্বণে বৃক্ষের একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে।

নগরসংস্কৃতি লোকঐতিহ্যকে মান্যতা দেয় না। লোকঐতিহ্যের বহমান ধারা তাদের কাছে নিতান্তই অজ্ঞানতাপ্রসূত নিরক্ষর মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিচয় বহন করে। লোকসাহিত্য মূলত অনগ্রসর কৃষিনির্ভর পল্লিমানুষের নিজস্ব লোকপ্রজ্ঞা। 'প্রজ্ঞা' অর্থে জ্ঞান নির্দেশিত হলে এক্ষেত্রে নগর সংস্কৃতি শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান, অন্যদিকে আদিমসংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতি কৃষিকেন্দ্রিক ও পল্লিজীবন নির্ভর ঐতিহ্যের সহজাত ফসল। তাই এখানে ব্যক্তি প্রতিভা অপেক্ষা গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনচর্যা তথা প্রযত্নহীন সংস্কৃতির নান্দনিক কৃতির প্রকাশ ঘটে; তবে তা একেবাই শৌখিনতাবর্জিত, প্রযত্ন নিরপেক্ষ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকায়ত সমাজের ঐতিহ্য পরম্পরায় বাহিত শ্রুতিনির্ভর সাহিত্য। তাই লোকসাহিত্যচর্চার বিষয়

একেবারেই মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ বলেই লোকায়ত মানুষের সঙ্গে তার 'ভিতরকার একটি যোগ আছে।' বাংলার লোকসংস্কৃতি ও অভিজাত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যের জায়গাটি বেশ স্পষ্ট। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ অনেকাংশেই প্রাচীন জীবন-যাপন ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে বেঁচে থাকেন। কামার-কুমোর-তাঁতি-মাঝি ইত্যাদি বিচিত্র জীবিকার মানুষেরা প্রতিমুহূর্তে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ধর্ম-অনুষ্ঠান বিশ্বাস-সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। ফলে উভয় সংস্কৃতির পার্থক্য নির্ণয়ে বলা যায়—

১.

নগরজীবনের অভ্যস্ত মানুষ যে সংস্কৃতিকে লালন করেন সেই সংস্কৃতি একেবারেই মার্জিত ও সূক্ষ্ম মননের পরিচয় বহন করে। সেই সংস্কৃতির সঙ্গে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের এবং বিশ্বায়নের সম্পর্ক ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির যারা ধারক ও বাহক তাদের নান্দনিক বোধ-বুদ্ধি লোকায়ত শিল্প নির্ভর। এখানে আন্তরিকতার অভাব নেই কিন্তু আভিজাত্যের অভাব রয়েছে। অবশ্য এই পার্থক্যটুকু আছে বলেই পুঁজিনির্ভর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচারের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ব্যবধান বুঝে নেওয়া যায়।

২.

বহুজাতিক সংস্থাগুলি নগর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করায় সেখানে জীবনের মানোন্নয়ন অতিদ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য এর কুফলও আছে— পুঁজিবাদী সভ্যতা প্রতিমুহূর্তে চায় সামাজিক সংঘবদ্ধতা থেকে মানুষকে বিযুক্ত করতে। ফলে শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি অগণিত মানুষের থেকে নির্বাসিত হয়ে ব্যবচ্ছিন্ন ব-দ্বীপের মতো পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতি বিশেষ কোনো অঞ্চলের ভূগোল ভেঙে আরও বহুদূর প্রসারিত করেছে তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যের জ্ঞানপ্রতিমাকে।

৩.

নগরকেন্দ্রিক জীবন মূলত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তকে অবলম্বন করে গঠিত হয়। ফলে সেখানে উঁচু মাপের কবি-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের জ্ঞানচর্চার চলাফেলা লক্ষণীয়; অন্যদিকে পল্লিকেন্দ্রিক নিম্নবিত্তের জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে ব্রত-পাঁচালি-কথকতাকেন্দ্রিক অসংখ্য রূপ-রূপান্তরের ছবি।

৪.

শহুরে সংস্কৃতি পুঁজিনির্ভর হওয়ায় সেখানে বৈদ্যুতিন চ্যানেলের দৌরাত্ম্যে আমাদের মূল সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছে। দর্শক-শ্রোতাদের চাহিদার উপযোগী সিরিয়াল আমাদের চেতনার ঝুঁটি ধরে টান দেওয়ায় আমরা শৌখিন বিলাসী বানানো সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। নগর সংস্কৃতি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে যে পরিশীলিত চোখ ধাঁধানো প্রোগ্রাম উপস্থাপন করে তার সঙ্গে কোনো মিল নেই বাউল, ভাটিয়ালি, বৈষ্ণব গানের। নগর জীবন তো এখন ভুলেই গিয়েছে লোকগীতি, ছড়া, লোকনৃত্য, ভাটিয়ালি, বৈষ্ণব গানের।

নগর জীবন তো এখন ভুলেই গিয়েছে লোকগীতি, ছড়া, লোকনৃত্য কিংবা চণ্ডীমণ্ডপবেষ্টিত সংস্কৃতি। শুধু 'বারোয়ারি' শব্দটি শারদীয়া এলে মনে পড়ে, অন্য সময় লালনরা চর্চিত হন অধ্যাপকদের টেবিলে কিংবা বুদ্ধিজীবিদের রোববারের আড্ডায়।

৫.

কথকতা, রূপকথা, পুরাণাশ্রয়ী পাঁচালি, মহিলা মহলে সুর করে ব্রত পাঠ, রয়ান গান, নীলের গান—এসব এখনও বিলুপ্ত প্রায়। কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, তরজা এখন বিস্মৃত অধ্যায়ের মতো। ছৌ, মুর্শিদা, আলকাফ, বোলান—এসব নৃত্য-নাট্য-গীতাদি শহরের কোনো হল ভাড়া করে শৌখিন কিছু মানুষ দেখেন ঠিকই; কিন্তু পরবর্তী জেনারেশন এই মূল মাটির সংস্কৃতিকে ভুলে যাবে। যেমন তারা ভুলেছেন পটের গান কিংবা উৎসবের নিত্য প্রযোজনে যুক্ত আলপনা প্রদানের বিষয়। এসব সংস্কৃতি এখন 'বাবু কালচার' গ্রহণ না করলেও বঙ্গসংস্কৃতির এই শিকড়কে অস্বীকার করা যাবে না।

অবশ্য শহুরে অভিজাত সংস্কৃতি এত দ্রুত গ্রামীণ জীবনে পৌঁছে যাচ্ছে যে, লোকসংস্কৃতির মূল শিকড়ের গায়ে এসব নাগরিক সংস্কৃতি প্রচুর শৌখিন গুচ্ছমূল জড়ো হয়েছে। বিশ্বায়নের মার্কেটিং ব্যবস্থা গ্রামবাংলাকেও আমূল বদলে দিচ্ছে। ফলে লোকসংস্কৃতির মূল ঐতিহ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে গিয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, লোকসংস্কৃতি বিবর্তনশীল। ফলে তার বিবর্তন ও নবরূপায়ণকে স্বাগত জানাতে হবে।

৩ লোকসংস্কৃতির 'লোক'—'ব্রাত্য' ও 'মন্ত্রহীন'

যে দেশে মানবপ্রেম একমাত্র স্বীকৃত প্রেম, ভক্তি যেখানে তদ্‌গত চিত্ত এবং দেবতার আধিপত্য হাটে-বাজারে-মাঠে-ময়দানে সর্বত্র; সেই অধ্যাত্মবাদী দেশ ভারতবর্ষে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, উপেক্ষা নিষ্পেষণ হতবাক করে। অথচ শুনতে খারাপ লাগলেও অমোঘ সত্য এই ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকের নয়। যে ভদ্রলোকেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে লোকসাহিত্য সৃষ্টির অনর্থক অনিচ্ছাকৃত শ্রম ব্যয় করেন, তাদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ "যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি।" 'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষে' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের সমর্থন ছিল না। তাই নিজের আত্মপরিচয়ে তিনি ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিতদের সঙ্গে একাত্মতার কথা জানান—

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

এই ব্রাত্যদের কথা রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' (মাতৃ অভিষেক), 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' (প্রণতি), 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান' (অপমান)—এই তিনটি কবিতায় বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ

করেছিলেন, এই তথাকথিত ব্রাত্যরাই ভারতীয় সভ্যতার মূল স্তম্ভ। স্বামী জিতাত্মানন্দ যথার্থেই বলেছেন, 'বিরাট মানবতা বোধের প্রেরণায় বিবেকানন্দই প্রথম ইতিহাসের অবহেলিত অনাদৃত এই শূদ্র সমাজকে আহ্বান করেছিলেন নতুন শক্তিতে জাগাবার জন্য—'নতুন ভারত বেরুক'।[৭] স্বামীজীর প্রত্যাশিত 'নতুন ভারত' শুধুমাত্র শিষ্ট-মার্জিত সংস্কৃতির একাধিপত্য বিস্তারের জায়গা নয়; বরং এই ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে কর্মে ও ঘর্মে সিক্ত লোকায়ত সংস্কৃতির ভারতবর্ষ। লোকসাধারণ প্রকৃত অর্থে এই ভারতবর্ষের চালিকা শক্তি। এই লোকসাধারণ বা লোক গ্রামে, শহরতলীতে এমনকি শহরেও থাকতে পারে। কিন্তু নিজেদের প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার, ঐতিহ্য, ধর্মের সম্পর্কে তারা স্থান-কালের সীমারেখা টপকে যায়। শুধু তাই নয়, এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৌমভিত্তিক মানসিকতার পরিচয় দেয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কলকাতার অনতিদূরে শহরতলী হৃদয়পুরের শিবতলার সঙ্গে প্রায় সমসাদৃশ্য রয়েছে গাইঘাটা থানার রামপুর, সেয়না, মণ্ডলপাড়ায় অনুষ্ঠিত চড়কের।[৮] এর কারণ সম্ভবত এই যে, সমমনোভাবাপন্ন লোকসাধারণ যে ভৌগোলিক দূরত্বে থাকুক না কেন, গোষ্ঠীচেতনায় তারা এক। অর্থাৎ, 'লোক' নামে চিহ্নিত সমাজদেহের বৃহত্তম অংশ ধর্ম-কর্ম-বিশ্বাসে সমমনোভাবাপন্ন এবং তারা সমষ্টিগত জীবনচর্যায় অভ্যস্ত। লোক বা 'Folk'-এর পরিচয় নির্দেশে 'Encyclopaedia Britanica'-তে বলা হয়েছে—

> It is narrowed down to include only those who are mainly out side the currents of urban culture and systematic education, the un-lettered or little lettered in havitants of village or countryside.[৯]

বহুত্ববোধক 'লোক' শব্দটির ইংরেজি করলে যে 'Folk' বোঝায় তার কাছাকাছি আরও তিনটি শব্দ হলো 'People', 'nation' এবং 'race'[১০]। প্রত্যেকটি শব্দ 'সমগ্র', 'বৃহৎ', 'সমষ্টি' ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত। বৃহত্তর জনসমষ্টি যারা নাগরিক সভ্যতার থেকে দূরে মূলত কৃষি সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম তারাই 'লোক'। আরও প্রসারী দৃষ্টিতে বলা চলে, যারা চাকুরিজীবী নয়, আর্থিকভাবে সম্পন্ন নয়, শহুরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়, শিক্ষার আলোকশিখায় বর্ণোজ্জ্বল নয় তারাই হলো 'লোক'। 'লোক' কারা তার একাধিক প্রচলিত সংজ্ঞার তিনটি এমন—

i. Folk, a group of associated people; a primitive kind of post-tribal social organization; the lower classes or common people of an area.[১১]

ii. Folk in ethnology the common people who share a basic store of old tradition.[১২]

iii. Folk would be any group of people who share at least on common factor (for example common ocupation, religion or ethnicity.)[১৩]

কর্ম ও ধর্মসূত্রে যারা এক, জীবনযাত্রার মান ও জীবিকা বিষয়ে প্রায় কাছাকাছি এবং ভাষা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছেদ, আচরণগত দিক থেকে সমদৃষ্টিসম্পন্ন তারাই হলেন 'Folk' বা 'লোক'। এই 'লোক' মূলত অনগ্রসর জনসমাজ, কিন্তু তারা ঐতিহ্যবাহী। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় 'ফোক' বা 'লোক' সম্পর্কে লিখেছেন—

> সাধারণত 'ফোক' বা 'লোক' বলতে সেই বিশিষ্ট মানুষকে বোঝায় যারা কৃষিভিত্তিক পল্লি সমাজের অনগ্রসর মানুষ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আধুনিক

লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে 'ফোক' শব্দটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যারা ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং নৃ-জনজাতিগত বা ভাষা, পেশা ও জীবন-জীবিকাগত সমন্বয়ের সূত্রে গঠিত। সমচেতনা ও জীবনযাপন অন্বিত এবং সম ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ সংহত সমাজের মানুষই 'ফোক' বা 'লোক'।[১৪]

শহরে বাস করে নাগরিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যারা লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকগান পরিবেশন করেন তারা কিন্তু 'লোক' বা 'ফোক' নন। 'ফোক'কে তারা ব্যবহার করেন জীবিকার স্বার্থে। আবার পল্লি অঞ্চলে আর্থিকভাবে সম্পন্ন বিত্তবান শিক্ষিত মানুষও 'ফোক' নন। শহরে বাস করেও যারা জীবনচর্চা ও মানসচর্চায় পল্লির শিকড়টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, বিশ্বায়নের যুগেও যারা ঐতিহ্যবিমুখ হননি, বরং ভীষণভাবে ঐতিহ্যমুখী, তারা 'ফোক' এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শহরে বাস করলে কেউ 'লোক' নন, গ্রামে বাস করলেই তিনি লোক, এমন ভৌগোলিক মানচিত্রের বৃত্তে 'লোক'-এর মানদণ্ড বিচার্য নয়। আমরা অন্তত 'ফোক' বা 'লোক'-এর দশ-দিগন্তের সন্ধান দিতে পারি, যারা এই বৃত্তের মধ্যে পড়লে 'ফোক' রূপে বিবেচিত হবেন। যেমন—

১.

মূলত সংঘবদ্ধ এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠী (Particular class or group) হল 'ফোক' বা লোক'। এরা বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থান করে অন্য জনসমাজ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত করে। আঞ্চলিক পরিবেশ প্রসূত চিন্তা-চেতনা, লোক-লৌকিকতা, জীবিকা-পদ্ধতিতে এরা মূলত এক।

২.

ভূমিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ এই সংহত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সরল বিশ্বাসী। অবৈদিক ধর্মাচরণে আগ্রহী। প্রাত্যহিক চলমান জীবন-সংগ্রামে কঠোর এবং স্বভাবতই এরা শৌখিনতা-বর্জিত।

৩.

লোকসমাজের 'লোক'-এর বৃহত্তর অংশ নগরজীবন থেকে বহু দূরে নিভৃত পল্লি অঞ্চলে, কর্মসূত্রে কলকার-খানার কাছাকাছি শহরতলিতে বাস করে। জাত-পাত, ধর্ম-অধর্ম, ছুৎমার্গ, তিথি-নক্ষত্র, দিন-ক্ষণ-মাস, গোত্র-বর্ণ, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীআচার-প্রথা, ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে মুখর থাকে।

৪.

এরা সম ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এবং এই ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তি পরিচয়বিহীনভাবে সমষ্টিচেতনার পরিচয়বাহী। বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের আদি উৎস ব্রতশিল্প ও ব্রতকথা এদের ধর্মসাধনার অঙ্গ।

৫.

শিক্ষার আলোকশিক্ষা থেকে দূরস্থিত ও স্বাক্ষরতা অভিযানের প্রচেষ্টায়

কোনোরকম প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য-বঞ্চিত। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোন সময় যারা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসে থাকার সৌভাগ্য অর্জনে ব্যর্থ।

৬.

সহৃদয় ও প্রাণবন্ত হলেও একালের মার্জিত নাগরিক রুচির দৃষ্টিতে যারা পুরাতন, সেকেলে এবং নিতান্তই লোকায়ত, তারাই হলো 'লোক'। প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির ওপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাববিস্তার সত্ত্বেও যাদের নিজস্ব নৃত্য-গীত, শিল্প-সংস্কৃতি বেশ পুষ্ট ও ঐতিহ্যবাহী, তারা চিহ্নিত হয় 'লোক' নামে।

৭.

'লোক' বলতে বোঝায়, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অসম্ভব গতির সঙ্গে যাদের পরিচয় ঘটেনি এবং এখনও স্থিতিশীলতায় যারা মন্থর। জীবনযাপনে নিতান্তই সাদাসিধে। লোকায়ত লোকধর্মে যাদের বুদ্ধি-বিবেক-বোধ পরিচালিত। তুকতাক, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র-বশীকরণ, কবচ-মাদুলীতে যারা কল্যাণের পথ খোঁজে।

৮.

নিজেদের বিশ্বাসের জগৎ ও নীতি-নৈতিকতায় এরা একত্রিত। গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। কর্মসূত্রে স্থানান্তরিত হলেও এরা মূলত ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল।

৯.

প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত। অসংখ্য গ্রামদেবতা, প্রকৃতি-দেবতা, ভূত-প্রেত-ডাইনি-দৈত্য সম্পর্কে কৌতূহলী।

১০.

জীবন-যাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-বাসস্থান, কথাবার্তা, ভাষা চয়ন, বিশ্বাস-সংস্কার, ঔষধপত্র, নান্দনিক অভিব্যক্তিতে যারা স্বতন্ত্র; তারাই হলো 'লোক'।

এভাবে আরও একাধিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হতে পারে রাষ্ট্র ও সমাজের গরিষ্ঠ অংশ 'লোক' বা 'Folk'। আর সমাজ জীবনের এই বৃহত্তম অংশ 'লোক' যে-সমাজে বাস করে সেই বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের চিহ্নিত মানুষজনেরাই 'লোকসমাজ'।

➲ লোকসংস্কৃতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে

বিশেষভাবে কোনো চিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সমজাতি-সম্প্রদায়-বর্ণের মানুষ বসবাস করলে এবং সমপ্রাণতার মাধ্যম হিসেবে একই ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠলে সেই ঐক্যবদ্ধ সমাজকে 'লোকসমাজ' বলা হয়। এই লোকসমাজকে তার নিজস্ব প্রাণধর্মে ও স্বভাবগত স্বকীয়তায় চিনে নেওয়া যায়। নিজস্ব জীবনপ্রণালী, ধ্যান-ধারণা, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি দিক থেকে

লোকসমাজের নিজস্বতা রয়েছে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মার্জিত সমাজ ও আদিম সমাজের সংযোগ সেতু হল লোকসমাজ। সুতরাং এদিক থেকে 'আদিম স্তর থেকে উন্নত এবং সংহত জীবন যাত্রার প্রণালিবদ্ধ রূপকে বলে লোকসমাজ।'[১৫]

লোকসমাজ সংহত। বরাবরই স্বতন্ত্র। তারা যূথবদ্ধ। গোষ্ঠীর আনুগত্যে চলা এই লোকসমাজ অনেক ক্ষেত্রেই অনমনীয় এবং কোথাও চূড়ান্ত রক্ষণশীল। শিক্ষার অরুণোদ্ভাস সম্বলিত সর্ববিস্তারী আলো সেখানে বর্ষণ না করায় সংস্কারের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আবার একটি বৃহত্তর অঞ্চলে পৃথক পৃথক লোকসমাজ স্বতন্ত্র বৃত্ত রচনা করলে অনেক সময় ভ্রম হয়, এই ভিন্ন অথচ নিজস্ব ছন্দে চলা লোকসমাজ অন্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কিনা।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত চারঘাট গ্রামে রাজবংশী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রীয়রা একত্রে বাস করছে; অথচ জীবনযাপনের পদ্ধতিতে অদ্ভুতভাবে পৃথক এবং স্বতন্ত্র। এ থেকে অনুমেয় যে, একই বৃত্তের মধ্যে থেকেও একের অধিক স্বতন্ত্র জীবনাচরণে অভ্যস্ত লোকসমাজ থাকতে পারে। এমনকি লোকমানসের পার্থক্য হেতু কখনও স্পষ্ট বিভাজন রেখাও লক্ষ করা যায়। যেমন, সাক্ষাৎকারে পূর্বে উল্লেখিত চারঘাটের রাজবংশীরা পাগলা বাবা বা শিবের ভক্ত। তারা মহাসমারোহে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক করে। মেলাও করে। তাদের বিশ্বাস—এর ফলে চাষবাস ভালো ও আর্থিক সমৃদ্ধি রক্ষিত হবে।[১৬]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি, পৌণ্ড্রক্ষত্রীয়রা শিব নন, শিবকন্যা মনসাকে পুজো করেন। তাদের বিশ্বাস এর ফলে মনসার কোপ থেকে গ্রাম রক্ষা পাবে। ঝড়-বৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।[১৭] এভাবে একই ভূখণ্ডের মধ্যে লোকসমাজের ভিন্ন অথচ স্বতন্ত্র চিহ্নিত একের অধিক শ্রেণিবিন্যাস গড়ে ওঠা আশ্চর্যের নয়। স্বতন্ত্র এই শ্রেণীবিন্যাস সচল, প্রাণবন্ত ও নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারী। এভাবে আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব, পূজা-পার্বণ, চিন্তা ও মননের সুস্পষ্ট প্রতিফলনে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল এক-একটি লোকসমাজ। আর এই লোকসমাজ যেহেতু নাগরিক সমাজ ও আদিম সমাজের মধ্যবর্তী স্বতন্ত্র সমাজ তাই এর মধ্যে চলমানতার সুর অনেক বেশি। লোকসংস্কৃতি গবেষকের মনে হয়েছে—"A folk society as opposed to a primitive tribe on the one hand and modern civilization on the other."[১৮]

নাগরিকতার সামুদ্রিক ঝোড়ো ঢেউ লোকসমাজের উচ্ছল প্রাণের তটে অনেক সময় আছড়ে পড়ে ঠিকই; তথাপি সুখের কথা এখনও লোকসমাজকে এক ঝলকেই চিনে নেওয়া যায়। খুঁজে নেওয়া যায় 'লোক' ও তার 'সমাজ' অর্থাৎ 'লোকসমাজ' এবং 'লোক' ও তার 'সংস্কৃতি' অর্থাৎ 'লোকসংস্কৃতি'কে।

সমকালীন রাজনীতি-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবে লোকসমাজ পরিবর্তিত হয়। তবু এই সমাজ যেহেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সেহেতু গোষ্ঠীর প্রভাব এখানে অবধারিত সত্য। ফলে লোকসমাজের মধ্যে জাতি-চরিত্র এবং দেশ-কালের প্রভাব অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদীরা ভাবের ঘোরে বিশ্বাস করেন না। এঁরা কাল সম্পর্কে সতর্ক বলেই একটি জাতির ক্রমবিকাশে ইতিহাসকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে কার্য-কারণের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে বলে অতীতের উপর নির্ভর করে বর্তমানকে তাঁরা বিচার করেন।

সাহিত্যের বিচার তাই এক ঐতিহাসিক বীক্ষা, কেননা 'সাহিত্যমাত্রই একটি ঐতিহাসিক শিল্প'।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক' শব্দে ঐতিহ্যের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগ দেখেছেন এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 'সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' নামাঙ্কিত গ্রন্থে। লোকসমাজ ঐতিহ্য পরম্পরায় যে সৃজনশীল প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে তার মধ্যে আর্থ-সমাজ বীক্ষার অলিখিত বহু উপাদান পাওয়া যায়। এগুলি কল্পনা নির্ভর নয়, বরং লোকায়ত জনজীবন বিশ্লেষণে অপরিহার্য অঙ্গ। কীভাবে সমাজ-রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজের পরিবর্তন হয় সে বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী গবেষকেরা লোকসমাজের সামগ্রিক কৃতিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

➲ লোকসংস্কৃতি—তত্ত্বগত পরিসর

এক অর্থে 'লোক'-এর 'সংস্কৃতি' হলো 'লোকসংস্কৃতি'। যে 'লোর'-এর বুৎপত্তি ও তাৎপর্য নির্ণয়ে হাজারতর বিতর্ক, প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্ন সেই বিতর্কের রায়ে সহৃদয় পাঠক কিন্তু অন্যান্য বিকল্প অর্থকে স্মরণে রেখেও 'লোর'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি'কে বেছে নিয়েছেন। 'ফোকলোর'-এর অন্তত পনেরোটি প্রতিশব্দ এবং নিজের অভিমত অনুসারে 'লোককৃতি' শব্দটিকে নির্বাচন করেও অবশেষে সুন্দর মীমাংসিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের—

> 'লোক' ও 'সংস্কৃতি' শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে তা সাধারণ মানুষের লৌকিক সংস্কৃতির তথা 'ফোকলোরেরই প্রতীক হয়ে ওঠে।... পণ্ডিতমহলে বা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে প্রতিশব্দ সম্পর্কিত বিতর্কের অবকাশ স্বীকার করে নিয়েও প্রচলনগত সিদ্ধির কথা স্মরণে রেখে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি গ্রহণ বা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[১৯]

যথার্থ প্রতিশব্দ প্রণয়নে বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজের অনেকেই যেমন 'ফোকলোর'কে করেছেন ধরাশায়ী, তেমনি সংজ্ঞা নির্ণয়েও তাঁরা 'ফোকলোর'কে জটিলতামুক্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত সঠিক অবয়ব দিতে পারেননি। আসলে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনার ক্রমাগত ব্যাপকতা পাওয়ায় একটি মেদহীন, একমুখীন সংজ্ঞায় এর সমস্ত শরীরকে বেঁধে দেওয়া সুকঠিন ও বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, 'লোকসংস্কৃতি' সেই আত্মগোপনকারী ও বর্ণচোরা শব্দ, যার সম্পর্কে ধারণা করা চলে কিন্তু যথার্থ ও নির্দোষ সংজ্ঞা টানা চলে না।

পুথিনির্ভর ও পাণ্ডিত্যসর্বস্ব জীবন অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর গোষ্ঠীজীবন থেকে। বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে আসে বিযুক্তিকরণ। এই বিযুক্তিকরণ নগরসভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ। কেননা এর ফলে ব্যক্তি আমি যেমন প্রচণ্ড স্বার্থপর হয়ে ওঠে; তেমনি নৈরাশ্য, হতাশা, বিষাদে ভোগে। এরা একক ও নিঃসঙ্গ, যে কারণে এদের সংস্কৃতি প্রাণহীন ও জড়সর্বস্ব। এরাই জন্ম দেয় যৌন ও শরীর-সম্পর্কিত স্থূল ধারণা। তাই নগরসংস্কৃতি সভ্যতার ধারক ও বাহক নয়। এ সংস্কৃতি বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি নয়। ধার করা, ঋণ নেওয়া পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ-সর্বস্ব অর্ধ-মৃত সংস্কৃতি। তবে পল্লির সঙ্গে যাঁরা প্রাণের সম্পর্ক রেখেছে, তাঁরাই শেষপর্যন্ত সুস্থ ও বিকল্প সংস্কৃতির জন্ম দিতে পেরেছেন। বর্তমান একুশ শতকের নাগরিক লেখকদের মধ্যে যাঁরা গ্রাম সংস্কৃতিকে পছন্দ করেন ও লেখার মধ্যে উপস্থাপন করেন, সম্ভবত তাঁদের গরিষ্ঠ অংশ 'পপুলার' লেখক হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন। অন্যদিকে

যে মহাজীবন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সর্বত্র কাজ করে চলেছে, তাদের সংস্কৃতি হল স্বতস্ফূর্ত; প্রাণসমৃদ্ধ ও সচল। এই প্রবাহমান ও গতিশীল সংস্কৃতির প্রাণ হলো লোকায়ত চেতনা। লোকায়তচেতনা সম্পৃক্ত সংস্কৃতির মধ্যে সভ্যতার হৃৎস্পন্দন বহমান থাকে। তাই কোনো জাতির সামগ্রিক সত্তাকে জানতে হলে লোকসংস্কৃতির পাঠ অপরিহার্য।

পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলি যেমন বহু হাতের ফসল এবং একটি জাতির প্রাণস্পন্দন তার মধ্যে ধ্বনিত হয়; তেমনি লোকসংস্কৃতিও একক কোনো ব্যক্তির মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের নন্দিত পুষ্প নয়। লোকসমাজ থেকে অভিজ্ঞতা ও উপকরণ নিয়ে কোনো লোক বা ব্যক্তি লোকসংস্কৃতির এক একটি পর্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। তারপর কালের বহমানতার স্রোতে লোকসমাজের মধ্যে 'এক দেহে হল লীন'-এর মতো মিশে যায় একক ব্যক্তির সৃষ্টি। যেমন, লোকসাহিত্যের নির্মাতা একসময় মিশে যায় গোষ্ঠীর মধ্যে। লোকশিল্প, লোকগান, লোককথা কবে কার মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল, তার হিসেব মেলানো দুঃসাধ্য। তাই 'Individual creation' নির্মাণ ও বিনির্মাণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় 'Communal re-creation' বা 'Collective creation'-এ রূপ পায়। লোকসংস্কৃতি তাই ব্যক্তির নয়, সমষ্টির। এর স্রষ্টা একজন নয়। বহুস্বরের হয়ে একজন প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। এক সময় যা বংশ পরম্পরায় মেনে আসা হয়েছে, তাকেই যখন কোনো একজন নিজের মতো লেখ্যরূপ দান করেছে, তখন তা প্রামাণিক উপাদান হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কোনো একজন ব্যক্তির নাম যুক্ত হলেই, তার একার কৃতিত্ব সেখানে আরোপিত হবে না। এই অর্থে জি.পি. কুঠার 'Communal product'-এর প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন—

> It is essentially a communal product, handed down from generation to generation, and committed to writing by trained investigators.[২০]

সংহত লোকসমাজের ঐতিহ্যপরম্পরায় বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, ধর্মানুশীলন থেকে শুরু করে তাদের মুখের ভাষা বা লোকভাষা, খেলা-ধূলা বা লৌকিক ক্রীড়া, লোকনৃত্য, লোকসংগীত কাল থেকে কালান্তরের পথ বেয়ে কবে এগিয়ে যায়। এইসব সৃষ্টির যেটুকু সমাজের নান্দনিক অনুভূতিরূপে অনুমোদন পায়, তাকেই সংস্কৃতিরূপে মেনে নেওয়া হয়। তাই লোকসংস্কৃতির মধ্যে 'group-oriented and tradition-based creation' বড় হয়ে দেখা দেয়।[২১]

Mac Edward Leach বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে বললেন, 'Probably originally the product of individuals' শেষ পর্যন্ত একক-দশক-শতক পেরিয়ে পরিণত হয় 'group product'-এ। এভাবে ব্যক্তি-স্রষ্টা মিশে যায় লোকসমাজের প্রবাহিত সামুদ্রিক সৃষ্টিকর্মের অকূল জলতরঙ্গে। আর তখন এককের মধ্যে মিশে যায় বহুস্বর। ঘুরিয়ে বললে বহুকণ্ঠের মধ্যে বিলুপ্ত হয় একক কণ্ঠ। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে Mac Edward Leach বলেছেন—

> Folklore is the generic term to designate the customs, beliefs, tradition, tales, magical, practices, proverbs, songs etc. in short the accumulated knowledge of a homogenous unsophisticated people.[২২]

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে Archar Taylor অনুরূপে 'Tradition'-এর যোগসূত্র অন্বেষণ করেছেন। এর মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, সে সম্পর্কে লিখেছেন—"It may be folk songs, folk tales, riddles, proverbs or other materials preserved in words."[২৩] লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক ব্যাপ্তি শুধুমাত্র মৌখিক সাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতি নামক বিরাট বিস্তৃত সমুদ্রে যেন মগ্ন শৈলশিলা। সুতরাং "আমরা যাকে লোকসাহিত্য বলি, তা ইংরেজি Folklore কথাটির অনুবাদ বা প্রতিশব্দ নয়।" ড. আশরাফ সিদ্দিকীর স্পষ্ট অভিমত "ইংরেজি ফোকলোর কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।" কি সেই ব্যাপক অর্থ এবং তার অর্থই বা কতখানি প্রসারিত, সেই আলোচনায় ড. দুলাল চৌধুরী লিখছেন—

> শুধুমাত্র লোকসাহিত্যকে ফোকলোর বলা চলে না, আবার শুধুমাত্র পালাপার্বণ, আচার অনুষ্ঠানই ফোকলোর নয়। বরং লোকায়ত সংস্কৃতির সামগ্রিকতাই ফোকলোর।[২৪]

বলাবাহুল্য, ড. মযহারুল ইসলামের মতো কোনো কোনো সংস্কৃতিবিদ 'ফোকলোর' এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকসংস্কৃতি'কে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেননি। তবে তাঁর যুক্তিকেও স্বাগত জানাতে হয়—

> লোকসংস্কৃতির মধ্যে ফোকলোরের Formalised দিক অর্থাৎ শুধু লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকভাস্কর্য ইত্যাদি নেই, অথবা ফোকলোরের Material দিক অর্থাৎ লাঙ্গল, জোঁয়াল, ঘর, বেড়া ইত্যাদি উপকরণসমূহ নেই, আছে লোকজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, আছে লোকধর্ম, লোকখাদ্য পদ্ধতির বিচিত্র দিক। অন্যদিকে ফোকলোরের দিগন্ত লোকসংস্কৃতির (Folkculture) ন্যায় বিস্তৃত নয়—ফোকলোর এদিক থেকে Folkculture-এর একটি অংশ মাত্র।[২৫]

বস্তুত, লোকসংস্কৃতির পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাই লোকায়ত সংহত সমাজের কর্মজীবন ও শিল্পজীবন তথা 'জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি'কে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় বললেন 'লোকসংস্কৃতি'।[২৬] নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি নয়, কিংবা ব্যক্তির মেধা, প্রতিভা, সৃজনীতে লোক-সংস্কৃতির প্রসার নয়, লোকসংস্কৃতি পুরাতন ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে এবং কোন বিশেষ জাতির আচার-আচরণ-ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার-উৎসব-অনুষ্ঠান-লোক-লৌকিকতা-তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে লোকসংস্কৃতির শৈশব-বাল্য-যৌবন অতিবাহিত হয়।

দৈনন্দিন অতি তুচ্ছ ঘটনা থেকে শুরু করে ব্যস্ততম জীবনযাত্রার ফাঁকেও লোকসমাজ তাদের নান্দনিক ক্রিয়াকর্মকে প্রাণবন্ত করে তোলেন লোকসংস্কৃতির মধ্যে। লোকসংস্কৃতি তাই পরম্পরাগত বিদ্যা, জাতিবিদ্যা। পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য এর মধ্যে থাকে সংরক্ষিত, গোষ্ঠীর বিদ্যা-বুদ্ধি, বিশ্বাস-ধারণা, লোকবিজ্ঞান, লোককথা, লোকসংগীত, লোকাভিনয়, লোকভাষা, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লোকায়ত লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত মনের জাতক। লোকসমাজের সৃজনশীল কর্ম (Creative artistic work) প্রয়োজনগত মূল্যকে অতিক্রম করে অন্য আর এক শিল্পনন্দনতত্ত্বগত মূল্যকে প্রকাশ করেছে।

➲ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

'লোকসংস্কৃতি' অর্থে লোকসমাজের সৃষ্টি মৌখিক সাহিত্য থেকে শুরু করে নৃত্য, গীত,

অভিনয়, সংগীত, শিল্প, ক্রীড়াকৌতুক, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম, ঔষধ-পথ্য, পালা-পার্বণ, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি সামগ্রিক অভিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। তাই লোকসংস্কৃতির ভূগোল দ্বীপ থেকে মহাদেশ সর্বত্র প্রসারিত। শহর ও শহরতলিতে এই সংস্কৃতির শাখামূলের সন্ধান পাওয়া গেলেও গ্রামের মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত রয়েছে এর প্রধান মূল। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লি ও পল্লির কোলে লালিত সংস্কৃতিকে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন—

১. ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লিগ্রামকে দেখেছি।[২৭]
২. গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে উঠুক।[২৮]
৩. গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া থাকে।[২৯]

সাহিত্যের উপরি অংশ হলো গাছের উপর দিকের পত্র-পল্লব-ফুল-ফল সুশোভিত অংশের মত। আর নিম্ন অংশ গাছের শিকড় যা মাটির সঙ্গে মাখামাখি করে আছে। তাই লোকংস্কৃতি নামক শিকড়ের ওপরে উচ্চসংস্কৃতি বা নগর সংস্কৃতির নান্দনিক পরিকাঠামো নির্ভরশীল।

মানুষের ঐতিহ্যপরম্পরায় সংস্কৃতির যে প্রবহমান ধারাটি বয়ে চলেছে সেই ধারা কালে কালে এবং দেশভেদে এতখানি বৈচিত্র্যমুখী যে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্রকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত করা তর্কাতীত নয়। তথাপি আলোচনার পরিধিকে ধারাবাহিক ছন্দে ফেরানোর অভিলাষে আমরা এর কতকগুলি বৈচিত্র্যমুখী বিভাজন করে নিতে পারি। তবে এই বিভাজনই শেষ কথা নয়। নয়, এই কারণে যে, নিত্যনব নিরীক্ষার ফলে লোকসংস্কৃতির ব্যাপ্তি ঘটে চলেছে। তথাপি আমরা লোকসংস্কৃতির বস্তুকেন্দ্রিক (Material folklore) ও প্রায়োগিক (Formalised folklore) দিকের কতকগুলি বিভাজন উল্লেখ করতে পারি—

১. বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
২. অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৩. আচার-সংস্কার-বিশ্বাসকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৪. পূজা-পার্বণ-উৎসব অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৫. ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৬. বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৭. লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৮. শিল্পবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৯. লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিক

লোকসংস্কৃতির এই যে বিবিধ শ্রেণিবিভাজন, তার মধ্যে রয়েছে বহুবিধ প্রসঙ্গ। যেমন—

১.

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. ছড়া, ২. প্রবাদ, ৩. ধাঁধা, ৪. লোকসংগীত বা লোকগীতি, ৫. গাথা বা গীতিকা, ৬. কথা বা লোককথা, ৭. লোকবক্তৃতা, ৮. লোক-ব্যবহৃত উপমা, ৯. লোকভাষার বিভিন্ন দিক ইত্যাদি।

২.

অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. লোক-নৃত্য ২. লোকভঙ্গি ৩. লোক-কসরৎ ৪. লোকনাট্য ইত্যাদি।

৩.

আচার-সংস্কার-বিশ্বাস কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. লোকাচার ২. লোকবিশ্বাস ৩. লোক সংস্কার ৪. লোকবিজ্ঞান বা যাদু ৫. সর্বপ্রাণবাদ ৬. রূপান্তরবাদ ৭. নিয়তিবাদ ৮. মোক্ষলাভ ৯. পরলোকতত্ত্ব ১০. অলৌকিকতা ১১. আদেশ, উপদেশ, স্বপ্নাদেশ ১২. টোটেম ও টাবু ১৩. প্রথা ১৪. মিথ ১৫. বন্দনা ১৬. মন্ত্র ১৭. গুপ্তবিদ্যা ইত্যাদি।

৪.

পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. বৃক্ষ ও ঘট পূজা ২. লোকানুষ্ঠান ৩. মেলা ৪. লোক পার্বণ ৫. লৌকিক দেব-দেবীর পূজা ৬. তন্ত্র ইত্যাদি।

৫.

প্রয়োগধর্মী লোকসংস্কৃতি

১. গুপ্তবিদ্যা ২. ঝাঁড়ফুক ৩. লোকচিকিৎসা ৪. লোকঔষধ ৫. তাবিজ, কবজ ইত্যাদির ব্যবহার।

৬.

ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. নৌবাহন বা বাইচ ২. কুস্তি ও লাঠিখেলা ৩. কবুতর উড়ানো ৪. কানামাছি ৫. বাঘবন্দী ৬. ড্যাংগুলি ৭. বুড়ির চু ৮. কিৎকিৎ ৯. অনস্ক্রিয়াস ১০. রুমালচুরি ১১. পিট্টু ১২. লালকাঠি ১৩. গোল্লাছুট ১৪. লুকোচুরি ১৫. কড়িখেলা ইত্যাদি।

৭.

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. গৃহ সংক্রান্ত : পাটকাঠি বা চাঁচের বেড়া, কাঠ বা মাটির গৃহনির্মাণ ইত্যাদি।
২. কৃষি সংক্রান্ত : লাঙ্গল, জোয়াল, বিঁদে কাঠি, মই, কাস্তে, নিড়ান, পাঁচুনি, ঢেঁকি ইত্যাদি।
৩. যানবাহন সংক্রান্ত : গরুর গাড়ি, কলার-মান্দাস, নৌকা, পাল্‌কি ইত্যাদি।
৪. উৎপাদন সরঞ্জামসংক্রান্ত : কুমোরের চাকা, নাপিতের ক্ষুর, করাত, বড়শি, জাঁতি ইত্যাদি।
৫. অস্ত্রসংক্রান্ত : তীর, ধনুক, বল্লম, লাঠি, মুগুর ইত্যাদি।
৬. প্রসাধন সংক্রান্ত : বিভিন্ন ধাতু, পোড়ামাটি, ফুল, চন্দন, সিঁদুর, কাজল, নোয়া ইত্যাদি।
৭. বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত : বাঁশি, শিঙা, ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ মাদল, করতাল ইত্যাদি।

৮.

অঙ্কন বা লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. আলপনা ২. পট ৩. ঘটচিত্র ৪. দেওয়ালচিত্র ৫. তোয়ালি ৬. আসন ৭. রুমাল ৮. স্মৃতিফলক ইত্যাদি।

৯.

শিল্পবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

১. নক্‌শি কাঁথা ২. নক্‌শা করা টুপি ৩. নক্‌শা-করা পিঠা ৪. মুখোশ চিত্র ৫. লক্ষ্মীর সরা ৬. মাটির কাজ ৭. শঙ্খের কাজ ৮. শাঁখার কাজ ৯. বাঁশ-বেত-চাচের কাজ ১০. তালপাতা-খেজুর পাতা-হোগলা পাতার কাজ ১১. টেরাকোটা ইত্যাদি।

১০.

লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিক

১. নিম্নবর্গের বৃত্তি পরিচয় ২. জাতিভেদ ৩. লোক-লৌকিকতা ৪. ছুৎমার্গ ৫. লৌকিক শান্তি ও স্বস্তি ইত্যাদি।

যুগের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে এই উপাদানগুলিও একসময় সংস্করণ হতে পারে, কোনোটা লুপ্ত হতেও পারে। এমনকী, নতুন অনেক উপাদান যুক্ত হতে পারে। কারণ লোকসংস্কৃতি পল্লীসমাজে লালিত হলেও তা স্থিতিশীল নয়। সুতরাং এ সংস্কৃতির ক্ষয় বা বিলোপ নেই। বলাবাহুল্য, প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান গ্রিসের প্রাচীন সংস্কৃতি বর্তমানে অনেকখানি লুপ্ত হলেও, সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের লোকসংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে চলেছে, কিন্তু বিলোপ ঘটেনি।

২.

টাইপ ও মোটিভ ইনডেক্স

সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য লোককথা রয়েছে। সেই লোককথার শ্রেণিবিন্যাস করে তাকে নির্দিষ্ট একটি শৃঙ্খলায় আনার প্রচেষ্টা থেকে টাইপ-ইনডেক্সের প্রয়োজন হয়। স্টিথ টমসন 'The Folktale' নামাঙ্কিত গ্রন্থে টাইপের সংজ্ঞায় লিখেছেন—"A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale." (1977, P. 415)

টাইপ থেকে আমরা বুঝতে পারি একই বিষয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আর কোথায় কোথায় রয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সম্ভাব্য উৎসস্থল জানা যায়। যে আখ্যান পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, সেই একই আখ্যান পূর্ববঙ্গ কিংবা আরও প্রসারিত ভূগোলে এশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বে কীভাবে শৃঙ্খলিত হয়েছে, তা টাইপ ইনডেক্স থেকে বোঝা যায়। স্টিথ টমসন লোককথা টাইপ-ইনডেক্স এভাবে করেছেন—

১. পশুকথা _____

১—৯৯ বন্য পশু

১০০—১৪৯ বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু

১৫০—১৯৯ মানুষ ও বন্য পশু
২০০—২১৯ গৃহপালিত পশু
২২০—২৪৯ পাখি
২৫০—২৭৪ মাছ
২৭৫—২৯৯ অন্যান্য জন্তু ও বস্তু

২. সাধারণ লোককথা

৩০০—৩৪৯ ঐন্দ্রজালিক কাহিনি
৩৫০—৩৯৯ অলৌকিক বাধা
৪০০—৪৫৯ অলৌকিক বা মোহময় স্বামী/মোহময়ী স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়
৪৬০—৪৯৯ অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কার্য, অসাধ্য সাধন
৫০০—৫৫৯ অলৌকিক সাহায্যকারী/সাহায্যকারিণী
৫৬০—৬৪৯ জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬৫০—৬৯৯ অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭০০—৭৪৯ অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি
৭৫০—৮৪৯ ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনি
৮৫০—৯৯৯ রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনি
১০০০—১১৯৯ বোকা রাক্ষসের কাহিনি

৩. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি

১২০০—১৩৪৯ বোকার গল্প
১৩৫০—১৪৩৯ স্বামী-স্ত্রী
১৪৪০—১৫২৪ একজন নারীর/বালিকার কাহিনি
১৫২৫—১৮৭৪ একজন পুরুষের/বালকার কাহিনি
১৮৭৫—১৯৯৯ মিথ্যাবাদীর কাহিনি
২০০০—২৩৯৯ সূত্রমূলক কাহিনি
২৪০০—২৪৯৯ অশ্রেণিভুক্ত কাহিনি

মোটিফ-ইনডেক্সের সংজ্ঞা নির্ধারণে টমসন বলেছেন—

> A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it.

লোককথা সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যেভাবে আছে, তাদের এক একটি শ্রেণিতে সংযুক্ত করে বিশ্বজনীন একটি চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ করা হয়। এরফলে বিশ্বের যেকোনো মানুষ সেই চিহ্নিতকরণ সংখ্যা থেকে সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, যে বিষয়টি তিনি পড়ছেন, সেই বিষয়টি বিশ্বের আর কোথায় কোথায় সাদৃশ্যসূত্রে অন্বিত রয়েছে। স্টিথ টমসন তাঁর

বিশ্ববিখ্যাত 'মোটিফ-ইনডেক্স অব ফোক-লিটারেচার' নামাঙ্কিত গ্রন্থে মোটিফগুলি যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তা নিম্নে সজ্জিত হলো—

এ. লোকপুরাণ

এ ০	এ ৯৯	সৃষ্টিকর্তা
এ ১০০	এ ৪৯৯	দেবতা
এ ৫০০	এ ৫৯৯	উপদেবতা ও লৌকিক বীর
এ ৬০০	এ ৮৯৯	বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব
এ ৯০০	এ ৯৯৯	বিশ্বের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
এ ১০০০	এ ১০৯৯	প্রাকৃতিক দুর্বিপাক
এ ১১০০	এ ১১৯১	প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা
এ ১২০০	এ ১৬৯৯	মানুষের সৃষ্টি ও স্থিতি
এ ১৭০০	এ ২১৯৯	জীবজন্তুর সৃষ্টি
এ ২২০০	এ ২৫৯৯	জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য
এ ২৬০০	এ ২৬৯৯	গাছ-গাছালির সৃষ্টি
এ ২৭০০	এ ২৭৯৯	গাছ-গাছালির বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

বি.জীবজন্তু

বি ০	বি ৯৯	লোকপৌরাণিক জীবজন্তু
বি ১০০	বি ১৯৯	ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু
বি ২০০	বি ২৯৯	মানবিকগুণসম্পন্ন জীবজন্তু
বি ৩০০	বি ৫৯৯	বন্ধুভাবাপন্ন বা উপকারী জীবজন্তু
বি ৬০০	বি ৬৯৯	মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিয়ে
বি ৭০০	বি ৭৯৯	জীবজন্তুর অত্যাশ্চর্য গুণ

সি. ট্যাবু বা বিধিনিষেধ

সি ০	বি ৯৯৯	

ডি. ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু

ডি ০	ডি ৬৯৯	রূপান্তরকরণ বা আকৃতি পরিবর্তন
ডি ৭০০	ডি ৭৯৯	জাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া
ডি ৮০০	ডি ১৬৯৯	ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ
ডি ১৭০০	ডি ২১৯৯	জাদুশক্তি ও তার প্রকাশ

ই. মৃত

ই ০	ই ১৯৯	পুনর্জীবন
ই ২০০	ই ৫৯৯	ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা
ই ৬০০	ই ৬৯৯	অবতারত্ব বা পুনরায় শরীর গ্রহণ
ই ৭০০	ই ৭৯৯	আত্মা

এফ. অসাধ্য-সাধন

এফ ০	এফ ১৯৯	অন্য বিশ্বে যাত্রা
এফ ২০০	এফ ৬৯৯	বিচিত্র প্রাণী
এফ ৭০০	এফ ৪৯৯	অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু
এফ ৯০০	এফ ১০৯৯	অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ

ডি. ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু

ডি ০	ডি ৬৯৯	রূপান্তরকরণ বা আকৃতি পরিবর্তন
ডি ৭০০	ডি ৭৯৯	জাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া
ডি ৮০০	ডি ১৬৯৯	ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ
ডি ১৭০০	ডি ২১৯৯	জাদুশক্তি ও তার প্রকাশ

ই. মৃত

ই ০	ই ১৯৯	পুনর্জীবন
ই ০	ই ৫৯৯	ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা
ই ৬০০	ই ৬৯৯	অবতারত্ব বা পুনরায় শরীর গ্রহণ
ই ৭০০	ই ৭৯৯	আত্মা

এফ. অসাধ্য-সাধন

এফ ০	এফ ১৯৯	অন্য বিশ্বে যাত্রা
এফ ২০০	এফ ৬৯৯	বিচিত্র প্রাণি
এফ ৭০০	এফ ৮৯৯	অস্বাভাবিক স্থান ও বস্তু
এফ ৯০০	এফ ১০৯৯	অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহ

জি. রাক্ষস-খোক্কক-দৈত্য-দানব-ডাইনি

জি ০	জি ৩৯৯	নানাবিধ দৈত্য ও ডাইনি
জি ৪০০	জি ৫৯৯	পরাভূত দৈত্য-দানব

এইচ. পরীক্ষা

এইচ ০	এইচ ১৯৯	শনাক্তকরণ পরীক্ষা : চিনতে পারা
এইচ ২০০	এইচ ৪৯৯	বিবাহ-পরীক্ষা
এইচ ৫০০	এইচ ৮৯৯	চাতুর্যের পরীক্ষা
এইচ ৯০০	এইচ ১১৯৯	পৌরুষের পরীক্ষা : কার্যভার
এইচ ১২০০	এইচ ১৩৯৯	সাহসের পরীক্ষা : অনুসন্ধান
এইচ ১৪০০	এইচ ১৫৯৯	অন্যান্য পরীক্ষা

জে. চালাক ও বোকা

জে ০	জে ১৯৯	জ্ঞানার্জন ও রক্ষা
জে ২০০	জে ১০৯৯	চালাক ও বোকা স্বভাব
জে ১১০০	জে ১৬৯৯	চালাকি
জে ১৭০০	জে ১৭৯৯	বোকামি

কে. প্রতারণা

কে ০	কে ৯৯	প্রতারণার দ্বারা প্রতিযোগিতায় জেতা
কে ১০০	কে ২৯৯	প্রতারণার দ্বারা লাভ
কে ৩০০	কে ৪৯৯	চুরি ও প্রতারণা
কে ৫০০	কে ৬৯৯	প্রতারিত করে মুক্তি পাওয়া
কে ৭০০	কে ৭৯৯	প্রতারিত করে বন্দি করা
কে ৮০০	কে ৯৯৯	সাংঘাতিক প্রতারণা
কে ১০০০	কে ১১৯৯	নিজের ক্ষতি করেও প্রতারণা করা
কে ১২০০	কে ১২৯৯	অপমানিত হয়েও প্রতারণা করা
কে ১৩০০	কে ১৩৯৯	প্রলোভিত করে বা প্রতারিত করে বিয়ে
কে ১৪০০	কে ১৪৯৯	প্রতারিতের সম্পত্তি বিনষ্ট
কে ১৫০০	কে ১৫৯৯	ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত যে প্রতারণা
কে ১৬০০	কে ১৬৯৯	প্রতারক নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে
কে ১৭০০	কে ১৭৯৯	মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত করা
কে ১৮০০	কে ১৮৯৯	ছদ্মবেশ বা ভ্রান্তির দ্বারা প্রতারণা
কে ১৯০০	কে ১৯৯৯	ভণ্ড প্রতারক
কে ২০০০	কে ২১৯৯	মিথ্যা অপবাদ
কে ২২০০	কে ২২৯৯	খলনায়ক ও বিশ্বাসঘাতক
কে ২৩০০	কে ২৩৯৯	অন্যান্য প্রতারণা

এল. ভাগ্যচক্র

এল ০	এল ৪৯৯

এম. ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা

এম ০	এম ৪৯৯

এন. অদৃষ্ট ও কপাল

এন ০	এন ৮৯৯

পি. সমাজ

পি ০	পি ৬৯৯

কিউ. পুরস্কার ও শাস্তি

কিউ ০	কিউ ৫৯৯

আর. বন্দি ও পলাতক

আর ০	আর ৩৯৯

এস. অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা

এস ০	এস ৪৯৯

টি. যৌনবিষয়ক

টি ০	টি ৬৯৯

ইউ. জীবন-প্রকৃতি

ইউ ০	ইউ ২৯৯

ভি. ধর্ম

ভি ০	ভি ৫৯৯

ডাবলিউ. চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য

ডাবলিউ ০	ডাবলিউ ২৯৯

এক্স. হাসি-ঠাট্টা

এক্স ০	এক্স ১৭৯৯

জেড. বিভিন্ন মোটিফ

জেড ০	জেড ৯৯	সূত্র
ডেড ১০০	জেড ১৯৯	সংকেতধর্মিতা
জেড ২০০	জেড ২৯৯	বীর
জেড ৩০০	জেড ৩৯৯	বিশেষ ব্যতিক্রম

টমসনের এই মোটিফ ইনডেক্স বিজ্ঞানসম্মত। তিনি A–Z পর্যন্ত O, I এবং Y বাদে মোট ২৩টি বর্গ করেছেন। এর বাইরে কোনো ইনডেক্স হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি মূল ভাগের অন্তর্গত মোটিফের সংখ্যায় দশমিক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে তাঁর প্রদত্ত মোটিফ ইনডেক্সের বাইরে যদি নতুন কোনো ইনডেক্স-এর প্রয়োজন হয়ে পরে তাহলে দশমিক ব্যবহার করে সংযুক্তিকরণ করা সম্ভব।

➲ মোটিফ ইনডেক্স ব্যবহারের সুবিধা

১. লোককথায় যে বিষয়গুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি সাদৃশ্য সন্ধান করা হয়। সেই সাদৃশ্যকে মোটিফ ইনডেক্স-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা।

২. সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ-বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইনডেক্স সেই পার্থক্যগুলিকে সরিয়ে মূলত একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বর্গীকরণের ব্যবস্থা করায় যেকোনো লোককথাকে একটি নির্দিষ্ট বর্গে বিন্যস্ত করা যায়।

৩. আঞ্চলিক বা স্থানীয় যে বৈশিষ্ট্যগুলি লোককথায় থাকে, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যেও রয়েছে এক বিশ্বজনীন আবেদন। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি লোককথার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটি সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে এই লোককথাগুলিকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্গীকরণ করা যায়।

৪. লোকসংস্কৃতির গবেষক দিব্যজ্যোতি মজুমদার খুব চমৎকারভাবে লোককথা বিশ্লেষণে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায় লিখেছেন—"লোকসমাজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে যা কিছু মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছে তার পরিচয় স্পষ্টভাবে কিংবা প্রতীক-অভিপ্রায়ের মাধ্যমে

লোককথায় ছড়িয়ে আছে। আর এইসব সম্পর্কের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্সের মাধ্যমে।" (বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, গাঙচিল, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৩৯)

৩ বাংলা লোককথার বিভিন্ন ভাগ এবং টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স

বাংলা লোককথার বিভিন্ন ভাগ এবং টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স নির্মাণে যে সূচি নির্দেশ করেছেন দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সেগুলি হলো এমন—

১. পশুকথা

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির অধিকাংশ কাহিনি লোককথাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোকপুরাণের অসংখ্য উপাদান মঙ্গলকাব্যের কাহিনিকে করেছে পুষ্ট। কাহিনির ব্যাপ্তি ও কবির সৃজনী প্রতিভার মৌলিকত্বে কোনো কোনো মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠেছে 'primitive epic'-এর কাছাকাছি; কখনও এদের কোনটি 'National poetry' বা বাঙালির জাতীয় কাব্যের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। লোককথার নেপথ্যে আছে গভীর সমাজদৃষ্টি। Poetics নির্দেশিত 'a copy of reality'-এর মধ্যে না থাকলেও 'a higher reality'-র উপস্থিতি এখানে ঘটেছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্মের সঙ্গে লোককথার সংযোগসূত্র রক্ষিত হয়েছে এবং এর কাহিনিতে পাওয়া গিয়েছে 'social and political change' সম্পর্কিত সংবাদ। 'লোককথা' এদিক থেকে 'by the fact that it is still part of the living culture of every level society.'

পশুপাখিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানা লোককাহিনি। এগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত। পশুরা এখানে রূপক। এরা মানুষের মতো আচরণ করে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হীনতা-দীনতা, ভয়-বীরত্ব সবই পশুরূপকে প্রকাশিত হয়। এই পশুকথার অসংখ্য আখ্যান রয়েছে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। লোকায়ত মানুষের উপরে যে শোষণ-পীড়ন দেখা যায়, তা পশুর আদলে আমাদের সামনে উঠে আসে।

বস্তুত, 'পশুকথা' হল লোককথার উল্লেখযোগ্য মোটিফ। এর কাহিনিতে কৌতুকরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিরা পশুকথার মাধ্যমে নীতিকথার প্রচার করতে পারেন। তবে আখ্যানের প্রয়োজনেই পশু চরিত্রে মানব চরিত্রের গুণ সঞ্চার করেছেন। আর তখন আরণ্যক প্রাণী পারিবারিক কণ্ঠস্বরে কান্না-হাসির দোলাচলতায় মানুষের বোধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ড. আশরফ সিদ্দিকী পশুকথা ও নীতিকথার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করে লিখেছেন, "যে সব জীবজন্তুর গল্পে উপদেশ বা নীতি সংযুক্ত থাকে সেগুলিকে ইংরেজিতে Fable বলা হয়। বাংলায় এগুলিকে 'নীতিকথা' বলা যেতে পারে।" পশুকথাকে নীতিকথা বলতে চেয়ে আব্দুল হাফিজ লিখেছেন, "জীবজানোয়ারের কাহিনির সঙ্গে নীতি বা উপদেশ যুক্ত করলে তাই পরে Fable বা নীতিকাহিনিতে পরিণত হয়।" সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি লোকসমাজের মৌখিক ধারা থেকে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে গৃহীত হয়েছে। আজকের বিজ্ঞান-নির্ভর যুক্তিবাদের যুগে পশুকথার ভিত্তি দুর্বল বলে মনে হলেও মধ্যযুগের শ্রোতা বহু প্রাচীন কাহিনিগুলি মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুনেছেন এবং

নীতিকথার গভীরে ডুব দিয়ে সমাজ-সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও কাব্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক কথাগুলির মধ্যে লোকমনস্তত্ত্বের অন্দরমহলের সংবাদ পাওয়া যায়। আলোচ্য শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পশুকথার প্রাসঙ্গিক ভূমিকা ও গুরুত্বকে এভাবে আলোচনায় আনা যায়—

১.

টিয়াপাখির লঙ্কায় গমন ও তেঁতুল আনয়ন

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'মথন-পালায়' মহেশের আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ সত্ত্বেও কোনও পাখি লঙ্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্তে দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন না। কপোত, কোকিল, চকোয়া, রায়মণি, সারস—এদের কেউ লঙ্কায় যেতে রাজি হয়নি। মহেশ্বরের আদেশ শোনা সত্ত্বেও সবাই হতাশাজনক সুর শোনালে অগত্যা টিয়া তার ছোট্ট ডানাদুটি ভাসালেন নীল আকাশে—

যত পক্ষগণ রহে হেঁটমুণ্ড হৈয়া।
লঙ্কারে যাইতে পান উঠাইল টিয়া॥

শিব খুশি হয়েছিলেন। টিয়ার অসাধ্য সাধনের প্রয়াসের মধ্যে শিবের সুধাপানের পথ পরিষ্কার হওয়ায় তুষ্ট শিব জানিয়েছিলেন—"মহেশ বলেন টিয়া তোমার কল্যাণ।/তোমার প্রসাদে তবে করি সুধাপান॥/তেঁতুল আনিতে পার তবে দেখি ভাল।/মনে না করিহ ভয় লঙ্কাপুরী চল।/সুবর্ণে তোমার পাখা করিব ভূষিত।/অন্তে তোর বর দিব কাম্য বিরচিত॥" মহাশূন্যে ডানা ভাসিয়ে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সবুজ নরম পালকের টিয়া চলল রূপসী বাংলা ছেড়ে লঙ্কার গহন পুরীতে। তেঁতুলের বন দেখে হরষিত হলো কর্তব্যসচেতন টিয়া। কেতকাদাস দুঃসাহসী এই পক্ষীর কথা জানিয়ে লিখেছেন—"পবনে করিয়া ভর তথা গেল টিয়া।/মনে হরষিত বড় তেঁতুল দেখিয়া॥/ডালেতে বসিয়া তার খাল্য একখান।/একখান তেঁতুল লয়্যা করিল পয়ান॥/যেখানে বসিয়াছিলা দেবগণ সাথে।/তেঁতুল আনিয়া দিল মহেশের হাতে॥" লোককথার মোটিফ ইনডেক্স্ অনুসারে 'জীবজন্তু' পর্যায়ভুক্ত এই অংশে পাখির এই প্রশংসনীয় পরোপকারকে বি ৪৫০ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

২.

কাক কথা বলে

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের "মনসার জাগরণ পালা"র অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয় হল—

১. অমলার নিকট শ্বেতকাকের গমন।
২. লখিন্দরের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে অমলার ক্রন্দন ও বেহুলাকে ফিরিয়ে আনতে পুত্রদের নির্দেশ।

বেহুলার সংবাদ প্রদানে শ্বেতকাকের ভূমিকা মানবিক এবং দূতীর। 'শ্বেতকাকের প্রতি বেহুলার বাণী' নামাঙ্কিত কাব্যাংশে শ্বেতকাকের কাছে বাল্যবিধবা বেহুলা তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনিয়ে বললেন—"বসিয়া চাঁপার ডালে শুন শ্বেতকাক।/লোহার বাসরে হৈল আমার

বিপাক।।.../এমন ব্যথিত এথা নাহিক আমার।/আমার বাপের বাড়ী কহে সমাচার।।" বেহুলার অনুরোধে শ্বেতকাক 'মনুষ্যভাষা'য় বেহুলার যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করেছে। বেহুলার শোকে সমব্যথী শ্বেতকাকের কাছে বেহুলার মাতা অমলাসুন্দরী জানতে চান—"কোথা হৈতে আল্যা হে ব্যথিত শ্বেতকাক।/তুমি কিছু জানহ বেহুলার বিপাক।।" লখিন্দরের মৃত্যুসংবাদ শোনায় শ্বেতকাক এবং অনুরোধ করে দ্রুত বেহুলার কাছে তারা যেন পৌঁছে যান। শ্বেতকাকের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়— "শ্বেতকাক বলে শুন অমলাবেন্যানী।/ বেহুলার সমাচার আমি ভাল জানি।।/লোহার বাসরে তার হৈল দৈবাঘাত।/কালসর্পেতে খাইল তার প্রাণনাথ।।/উপদেশ শ্বেতকাক বলে বাক্যছলে।/বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রভু লৈয়া কৈলে।।/বেহুলার পিতৃকুলে যদি কেহ থাকে।/বেহুলা ভাসিয়া যায় দেখ গিয়া তাকে।।"

৩.

শৃগাল কথা বলে

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'বেহুলার শিআল্যায় গমন' শীর্ষক কাব্যাংশে মৃত স্বামীকে নিয়ে বঙ্গের বধূ বেহুলা আম-জাম-কাঁঠাল-হিজল-অশ্বত্থের ছায়াঘন গ্রামবাংলা পিছনে ফেলে চলেছিলেন গাঙুরের ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের টানে। দুর্গম সে যাত্রা। তবু নিরুপায় বেহুলা ভাসতে থাকে। প্রতিকূল পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হবেই। কবি কেতকাদাসের কলমে বেহুলার অনন্ত পথযাত্রা অপূর্ব বর্ণনায় যথাযথ রূপ পেয়েছে। মৃত স্বামীর মুখে মাছি এসে বসলে বেহুলা কাপড়ের অঞ্চল দিয়ে মেদুর মমতায় মাছি তাড়িয়েছেন। কঙ্কালসর্বস্ব স্বামী তাঁর কাছে মৃত জড়মাত্র নয়। বেহুলার স্বামীপ্রেমের আন্তরিকতায় অভিভূত কবি লিখেছেন—"মাছি ক্ষণে ক্ষণে/প্রভুর বদনে/উড়িয়া বৈসে গিয়া।/বেহুলা নাচনী/তাড়েন আপনি/নেতের আঁচল দিয়া।।"

স্বামী বেহুলার কাছে জীবন-মরণের সমান। 'স্বামী' বঙ্গের বধূর কাছে একটা 'আইডিয়াল'। তাই 'মৃত পতি কোলে' 'দিবস রজনী/ভাসেন নাচনী'। 'নাচনী' শব্দ প্রয়োগের মধ্যে কবি বঙ্গললনার নৃত্যপটীয়সী রূপের চিত্রময় আর্কেটাইপ তুলে ধরেছেন। বহমান নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার সময় 'সপ্ত দিবানিশি' উপবাসী শৃগালেরা বেহুলাকে উদ্দেশ্য করে জানায়— "সপ্ত দিবানিশি/আছি উপবাসী/যতেক শৃগাল পাল।/মড়া দিয়া মোরে/তুমি যাহ ঘরে/খ্যাতি রহু চিরকাল।।" কিন্তু বেহুলা নিরুপায়। গলিত শবের মূল্য তাঁর কাছে প্রাণাধিক। আসলে এক একটি সময় আসে যখন সামান্য বস্তু অসামান্য ও অমূল্য হয়ে ওঠে। লখিন্দরের প্রাণহীন দেহ বেহুলার কাছে প্রাণতুল্য। সুতরাং বেহুলাকে জানাতে হয় শৃগালের প্রত্যাশিত খাদ্যবস্তু তাঁর প্রাণের অধিক—

কি আর কহিব যারে খাত্যে চাহ
সেই সে আমার প্রাণ।।

বেহুলার কথা শুনে উপস্থিত শৃগালেরা মৃতের পুনরুজ্জীবনের অসম্ভব বক্তব্যে কৌতুকবোধ করেছে। এখানে শৃগালের ভাবনার মধ্যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি যুক্ত হওয়ায় পশুর মানবায়ন ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যে যে পশুকথাগুলি আলোচনা আমরা করেছি সেগুলি নিঃসন্দেহে নিম্নলিখিত মটিফ ইনডেক্স-এর অন্তর্গত—

১—৯৯ বন্য পশু
১০০—১৪৯ বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু
১৫০—১৯৯ মানুষ ও বন্য পশু
২০০—২১৯ গৃহপালিত পশু
২২০—২৪৯ পাখি
২৫০—২৭৪ মাছ
২৭৫—২৯৯ অন্যান্য জন্তু ও বস্তু

২. রূপকথা

রূপকথার আখ্যান সম্ভব-অসম্ভব কল্পজগতের গল্প। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও প্রথিতযশা অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটেছে এই সব রূপকথায়।" রূপকথার মধ্যে পুরাতনকালের সুর অনুরণিত হয়। ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, "আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা হইতেছে, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত গ্রাম সাহিত্যের অবগুণ্ঠন মোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরে বিস্তৃত হইতেছে।"

হাজারতর নিষেধবাক্য, বাধা-বিপত্তি, রহস্যজাল রূপকথার জগৎকে Fantacy-র মোহময় জগতে নিয়ে যায়। আমাদের জীবনে যা কিছু 'অপ্রাপ্য' এবং যা 'দুর্বোধ্য' ও 'রহস্যময়', রূপকথা তাকেই পরিপূর্ণতা দান করে। প্রাপ্ত বয়স্ক বোদ্ধারা এর মধ্যে 'অলীকতা ও অবাস্তবতা'-র বিলাস লক্ষ করলেও শিশুর কল্পরাজ্যে রূপকথার মায়াময় জগৎ সজীব স্পর্শ দান করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকের দেওয়াল জুড়ে ছায়া কালোকালো।

রূপকথার রাজ্যে বিবাদ আছে, রক্তপাত নেই। ভয় আছে, মৃত্যুর অন্ধকার স্পর্শ নেই। ড. মযহারুল ইসলাম লিখেছেন—"রূপকথার এই সব পেয়েছির দেশে সাধারণ নায়ক ও কখনো নায়িকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে রাজ্য লাভ করে এবং শেষপর্যন্ত রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখে দিন যাপন করে।"

১.

মনসার শ্বেতকাকের রূপ ধারণ

দেবতার রূপ পরিবর্তনের ধারণা পুরাণপ্রিয়তার ফল। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবী মনসা একাধিকবার রূপ বদল করেছেন। 'Transformation motief'-এর দৃষ্টান্তস্বরূপ মনসার শ্বেতকাকের রূপ ধারণ উল্লেখনীয়। 'কলার মান্দাসে লখিন্দরসহ বেহুলা' শীর্ষক কাব্যাংশে কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসার রূপবদলের কথা লিখেছেন। কাব্যের কাহিনি অগ্রগতির কারণেই কবি এই বিষয়টি এনেছেন। বেহুলার অনিকেত পথে ভেসে যাওয়ার ঘটনাকে

পিতৃগৃহে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মনসা এখানে দূতির ভূমিকা পালন করেছেন এবং সেই কারণে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে রূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। কবি ক্ষেমানন্দ লিখেছেন—

বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে।
মনসা আইলা তথা শ্বেতকাক বেশে॥

২.

মনসার মালিনী রূপ ধারণ

কেতকাদাসের কাব্যে 'ধন্বন্তরির শিষ্যবধার্থ মনসারা মালিনীবেশে গমন' অংশে দেবী ফুলওয়ালী হয়েছেন এবং শঙ্খিনীনগরে অবস্থিত ধন্বন্তরির ঘরে গিয়েছেন। ধন্বন্তরি শিষ্যদের নিয়ে 'ঝাঁপান'-এ ব্যস্ত ছিলেন। কবি লিখেছেন—"তথাকারে গেলা দেবী হইয়া মালিনী।/পুষ্প নিবে নিবে বলে উচ্চনাদ বাণী॥/শুনিয়া আইল ওঝা কিনিবারে ফুল।/ছয় কুড়ি ছয় শিষ্য সঙ্গে অনুকূল॥" 'বিষমালা পরিধান করিয়া ওঝার শিষ্যগণের মূর্চ্ছিত হওন এবং ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক পুনঃপ্রাণদান' অংশে চতুরা মনসা ধন্বন্তরীর শিষ্যদের হত্যা করবার কৌশল আবিষ্কার করে মালা পরালেন। এর ফলে শিষ্যরা বিষাক্রান্ত হলেন। কবি লিখেছেন—

পরাইয়া পুষ্পমালা বিষহরি দেবী গেলা
নিজ বেশে আপনার স্থানে।
বিনি সূতে পুষ্প-হার গলে দোলে সভাকার
বিপরীত লাগিল নিদানে॥

দেবী মনসা যে এখানে মায়াশক্তি বিস্তার করেছেন, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কেতকাদাস লিখেছেন—"মায়া করি সেই ধনী/এসেছিল সুমালিনী/পুষ্প দিয়া পাতিল প্রলয়॥" দেবীর এই মায়া সৃজন ও প্রতারণা করা নিঃসন্দেহে কাব্যকাহিনি নির্মাণের অন্যতম কৌশল। পরবর্তীতে 'মেঘনাদবধ' কাব্য-এর ষষ্ঠ সর্গে মায়াদেবীর মায়া সৃষ্টি ও ইন্দ্রজিৎকে কৌশলে নিধনের উল্লেখ দেখি।

৩.

মনসার ব্রাহ্মণীবেশ ধারণ

কেতকাদাসের 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যের 'বিষহরির ব্রাহ্মণীবেশ ধারণ ও রাখাল-বালকদের ছলনা' শীর্ষক কাব্যাংশে রাখালদের ছলনা করেছেন দেবী। তিনি নির্জের স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ছল করে রূপ গোপন করেছেন। তাঁর ছদ্মবেশ ধারণ পদ্ধতি আকর্ষণীয়, অভিনব। কবি কেতকাদাস লিখেছেন—"শুনিয়া সখীর বোল ভুজঙ্গ-জননী।/নিজ রূপ ত্যজি হইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী॥/গলে গজমতী-হার তাহা কৈল দূর।/হাতে কঙ্কণ-তাড় পায়ের নূপুর॥/পাণ্ডুর-আকৃতি হৈল মাথার কুন্তল।/তনু জরজর বুড়ী হীন হৈল বল॥" বনে রাখালরা দেবী সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। বৃদ্ধার মধ্যে এমন কোনও শক্তি থাকতে পারে, যা ডাকিনীবিদ্যার মতোই অব্যর্থ এবং নঙর্থক। সুতরাং রাখাল বালকেরা সচকিত হয়েছে। তারা ভয়ে সংকুচিত হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেছে—

ডাকিনী যোগিনী প্রত্যয় কি জানি
মনেতে রাখিহ ভয়।

হাসিয়া প্রশংসা করহ জিজ্ঞাসা
বুড়ী মাগী কিবা কয়॥

'রাখাল-পুজা পালা'য় দেবী মনসা ছলনায় নিজের পুজো লাভ করেছেন। যদিও রাখালদের কাছ থেকে পুজো পাওয়ার পর দেবীকে অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি চন্দ্রসদাগর-বণিকের কাছ থেকে পুজো আদায় করতে হয়েছে। কেননা, নিম্নবর্গের মানুষেরা পুজো দেওয়ার পরেও উচ্চবর্গের মানুষেরা দেবীকে স্বীকৃতি দেননি।

রূপকথা আখ্যানগুলি বাংলা লোককথা টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে বিন্যস্ত করলে দাঁড়ায় এমন—

৩০০—৩৯৯	অলৌকিক বাধা
৪০০—৪৫৯	অলৌকিক বা মোহময় স্বামী/মোহময়ী স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়
৪৬০—৪৯৯	অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য, অসাধ্যসাধন
৫০০—৫৫৯	অলৌকিক সাহায্যকারী বা সাহায্যকারী
৫৬০—৬৪৯	জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬৫০—৬৯৯	অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭০০—৭৪৯	অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি
৭৫০—৮৪৯	রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনি
৮৫০—৯৯৯	বোকা রাক্ষসের কাহিনি
১০০০—১১৯৯	স্বামী-স্ত্রী

৩. পরিকথা

মূলত পরিকে কেন্দ্র করে শিশু মনস্তত্ত্বে ভয়-ভীতিবোধ লক্ষণীয়। পরি সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে নানা রকম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে। আসলে এই সবই কাল্পনিক একটি বোধের জন্ম দেয়। বাংলা পরিকথাকে বিন্যস্ত করতে হলে যে মোটিফ ইনডেক্সের অনুসরণ করা আবশ্যক, সেগুলি হলো—

এফ ২০০	পরি
এফ ২১০	পরির দেশ
এফ ২১৩	দ্বীপের মধ্যে পরির রাজ্য
এফ ২৫১	পরির জন্মকথা
এফ ২৫২.২	পরিরানি
এফ ২৬১	নৃত্যরতা পরি
এফ ২৬৫	স্নানরতা পরি
এফ ৩৭০	পরিরাজ্যে গমন

৪. কিংবদন্তি

কিংবদন্তির মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি-শক্তি-সাহসের বিষয়। কিংবদন্তির মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব নানা আখ্যান লুকিয়ে থাকে। গুপ্তধনের সন্ধান, বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যান, অভিশপ্ত কোনো বিষয়,

অসম্ভব কোনো কাজ ইত্যাদি কিংবদন্তির মূল প্রেক্ষণবিন্দু। মঙ্গলকাব্যে কিংবদন্তির দৃষ্টান্ত তুলনামূলকভাবে লোককথার অন্য উপাদানের থেকে বেশ কম। কিংবদন্তির মধ্যে সত্য কম, সম্ভব-অসম্ভবের অলীক কাহিনি তুলনায় অনেক বেশি। কিংবদন্তির মধ্যে থাকে আত্মত্যাগ, পদে পদে মৃত্যুর সংকেত, ভয়, রোমাঞ্চ, বীরত্ব, শৌর্য ও প্রতিপক্ষকে জয় করবার অনমনীয় ইচ্ছা। পুরাকাহিনির অনেক পরে এসব শৌর্য-বীর্যমূলক কাহিনির জন্ম, তবে ঠিক কবে এদের উদ্ভব তার সময় নির্ধারণের অঙ্ক মিলিয়ে নেওয়া কঠিন। বস্তুত 'We do not know when these stories were first told in their present shape ; but wherever it was, primitive life has been left far behind.' 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'স্বর্গে বেহুলা'র যাত্রাকে কিংবদন্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 'বেহুলা-সহ নেতার দেবসভায় গমন' শীর্ষক কাব্যাংশে বেহুলা দেবসভায় যাওয়ার অনুমতি আদায় করেছেন নেতার সম্মতিতে—

দেবতাসভায় আমি লৈয়া যাব তোহে।
সন্ধানে নাচিবে যেন দেবগণ মোহে॥

'বেহুলার দেবসভায় নৃত্য' শীর্ষক অংশে নৃত্যে পারদর্শী বেহুলা দেবতাদের অভিভূত করেছেন। কবি কেতকাদাস মনসার নৃত্য ও গানের সাফল্যের মধ্যে মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের গল্প বেঁধেছেন। তিনি লিখেছেন—"নাচেন অপূর্ব্বতালে/দেবগণ ভাল বলে/বেহুলা নাচেন সুরপুরে।" কিংবদন্তির টাইপ-ইন্‌ডেক্‌সের ৮০২ স্বর্গে কৃষক-এর মতো বেহুলার দেবসভায় পৌঁছানো যেন এক অপরূপ কল্পকাহিনি। বাংলা কিংবদন্তি টাইপ-ইনডেক্‌সের কয়েকটি পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো—

৪০৬খ ভাগ্যের খোঁজে যাত্রা
৭০৫ মাছ থেকে জন্ম
৭৫৫ পাপ ও পুরস্কার
৭৫৬ তিনটি সবুজ ডাল
৭৫৬ক নিষ্পাপ পুণ্যবান সাধু
৭৫৬গ মহাপাপী
৭৮০ গান-গাওয়া হাড়
৮০২ স্বর্গে কৃষক
৮১২ দৈত্যের ধাঁধা
৮৩১ অসৎ পুরোহিত

৫. ব্রতকথা

ব্রতের মধ্যে মূলত পারিবারিক মঙ্গলের কথা থাকে। ব্রতকথা নির্ভেজাল ধর্মীয় আখ্যান। তবে একথা বলতেই হয় যে, সব ব্রতকথা একই আখ্যানকে অবলম্বন করেই হয়। অর্থাৎ সেই ব্রতকথার মধ্যে নতুন কোনো বিষয় পরিকল্পনা করা হয় না। যে-কোনো ভাবে হোক না কেন, ভক্তির প্রতিষ্ঠা করাই যেন এই ব্রতকথার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাংলা ব্রতকথা টাইপ-ইনডেক্‌সের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রদত্ত হলো—

৭৫ দুর্বলকে সাহায্যদান
১২০ প্রথম সূর্যোদয় দেখা
১৬০ কৃতজ্ঞ পশু, অকৃতজ্ঞ মানুষ
২৮৫ শিশু ও সাপ
৩০৩ যমজ ভাই
৩০৪ শিকারি
৩১৫ অবিশ্বাসী বোন
৩৩৫ মৃত্যুদণ্ড
৪০৩ক ইচ্ছা
৪৩০ গাধা
৪৭৩ খারাপ বউয়ের শাস্তি
৫৬৪ মোহরভর্তি থলে
৬১৩ দুই পথিক
৬৭০ পশুর ভাষা
৭২৫ স্বপ্ন
৭৩৬ ভাগ্য ও ধনরত্ন
৭৫০খ আতিথেয়তার পুরস্কার
৭৫১ লোভী চাষিবউ
৭৫৬ক নিষ্পাপ পুণ্যবান সাধু
৭৫৬গ মহাপাপী
৮৩১ অসৎ পুরোহিত
৮৪০ মানুষের পাপের শাস্তি
৯৩০ ভবিষ্যৎ-বাণী

৬. লোকপুরাণ

লোকপুরাণ থেকে মহাকাব্যের অধিকাংশ আখ্যান গৃহীত হয়েছে। লোকপুরাণের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে সৃষ্টিরহস্যের নানা তথ্য। লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করে অসংখ্য লোকপুরাণ মঙ্গালকাব্যের প্রতি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রয়েছে। আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গালকাব্যে প্রতিফলিত লোকপুরাণের দিকে চোখ রাখতে পারি।

১.

সৃষ্টি প্রকরণ

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের সময়সীমায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে সৃষ্টি প্রকরণ ব্যাখ্যা মঙ্গলকাব্যের গঠন কৌশলের সাধারণ বিষয়। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সৃষ্টি প্রকরণ ব্যাখ্যায় কবি লিখেছেন—"যখন না ছিল গোসাঞি সৃষ্টি স্থিতি লয়।/পবন আকার গোসাঞি ছিলা জ্যোতির্ময়।।/নাহি আদ্য অন্ত মধ্য কেবল কারণ।/পঞ্চ-মহাভূত সৃষ্টি করিলা সৃজন।।"

২.

সৃষ্টিকর্তা

যে সৃষ্টিরহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কারও জানা ছিল না, তাকে মনোমত ব্যাখ্যা প্রদানের কৌশল রূপে একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন দেখা গিয়েছিল। মহাশূন্যের মধ্যে বিচরণ করা সেই সৃষ্টিকর্তার কোনো মূর্তি কল্পনা না করে তাঁকে আদিদেব রূপে চিহ্নিত করে তাঁকে দিয়েই বিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে আবিষ্কার করা হলো—"আদ্যা শক্তি সৃজন করিলা মহাশয়।/কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলা তেজোময়।।/সত্ত্ব রজ তম গুণে ব্রহ্মা হরিহর।/সৃজন পালন ক্ষয় করে নিরন্তর।।" সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কারে সে যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভাবে ভয়-বিস্ময় মিশ্রিত কল্পনায় পুরাকথার রহস্যময় জগৎ উন্মোচিত হয়েছিল।

৩.

বৃষবাহন দেবতা

স্বামী নির্ম্মলানন্দ লিখেছেন—

> বৃষভ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বলবান্ এবং শুক্রল। কৃষি, পরিবহনাদি কার্যের দ্বারা বৃষভ যেমন গৃহস্থের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তেমনি প্রজননের প্রয়োজনে একটি বৃষভকে বহু গাভীর কামনা পূরণে সমর্থ দেখা যায়। বৃষভ কামবর্ষী। আশুতোষ শিবও নিত্য বরদ, তিনি ভক্তগণের কামনা বা অভীষ্ট পূরণে সর্বদা উন্মুখ। ভক্তের মঙ্গল বিধানে তিনিও কামবর্ষী বা অভীষ্টবর্ষী। এ বিচারেও শিবের সার্থক বাহন হয়েছে বৃষভ।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "যিনি রুদ্র-শিব তিনিই রুদ্র শিবের বাহন।" শিবমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে বৃষবাহন দেবতার কথা উল্লেখ আছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে শিবের বাহনরূপে বৃষের সবিস্তার বর্ণনাটি আছে—"আড় নয়ানে শিব চাহে এক দিষ্টে।/লাফ দিয়া উঠে শিব বলদের পীষ্টে।।/চল চল বলি শিব ঠেলা দিল পায়ে।/অন্তরীক্ষে যায়ে বৃষ বায়ুগতি ধায়ে।।/অতি শীঘ্র চলে বৃষ বায়ু সমতুল।/আঁখির নিমিষে গেল সরযুতের কুল।।" বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস্ অনুসারে বৃষবাহন দেবতা এ১৩৬.১.৩-এর অন্তর্গত।

৪.

সিংহবাহন দেবতা

পশুরাজ সিংহ মহাশক্তিময়ী দেবী দুর্গার বাহন। দেবীপুরাণ মতে "সিংহের অঙ্গে অঙ্গে নানা দেবতার শক্তি বিন্যস্ত। তার গ্রীবাতে বিষ্ণু, শিরে মহাদেব, ললাটে পার্বতী।" বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের 'মনসার জন্ম পালা'য় সিংহবাহন দেবীর কথা বলেছেন কবি—"দুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন কড়ি।/বায়ুবেগে জায়ে দেবী সিংহ পৃষ্ঠে চড়ি।।"

৫.

মূষিকবাহন দেবতা

মূষিক কৃষিভূমি ও গৃহে বসবাস করে। ধান, চাল, ফল তার প্রিয় খাদ্য। ফলে কৃষির সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য গণেশের বাহনকে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবরূপে

প্রতিপন্ন করে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিমত শুনিয়েছে—The mouse is the master of the inside of everything. বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহে মূষিকবাহনে গণপতি উপস্থিত হয়েছিলেন—"মূষিক বাহনে গতি/আগে চলে গণপতি/সিন্দূরে মুণ্ডিত স্থূলকায়ে।।"

৬.

অশ্ববাহন দেবতা

স্বামী নির্মলানন্দ লিখেছেন, "অশ্ব একটি হৃষ্টপুষ্ট ও তেজস্বী জন্তু এবং সেও যজ্ঞের অন্যতম মেধা—এ হিসেবে অগ্নির অশ্ববাহন যুক্তিযুক্ত।" বিজয় গুপ্ত লিখেছেন—"হরিণে পবন ধায়ে/আপনে আনল যায়ে/সপ্ত ঘোড়া রথে দিবাকর।।"

৭.

ময়ূরবাহন দেবতা

কার্তিক কৃষি ও প্রজননের দেবতা। তার প্রণয়িনী সন্তানোৎপাদনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী। ফলে কার্তিক ও ষষ্ঠীর সঙ্গে শস্য উৎপাদন ও সন্তান জন্মগ্রহণের সম্পর্কটি রয়েছে। সনৎকুমার মিত্র লিখেছেন, "কার্তিকের সঙ্গে শস্য উৎপাদন বা fertility এবং ময়ূরের সঙ্গে বর্ষা সমাগমের সম্পর্ক।" কার্তিক ও ময়ূর উভয়েই সৌন্দর্য ও বীর্যের সম্পর্কে অন্বিত হওয়ায় কার্তিকের ময়ূরবাহন যথার্থ। কার্তিকের ময়ূরবাহন মূর্তি মনে রেখে বিজয় গুপ্ত লিখেছেন—"মউরে কার্ত্তিক চড়ে/বামাগতি মনোহরে/পুষ্পরথে চলে ধনেশ্বর।।"

৮.

হস্তীবাহন ইন্দ্র

নবজলধর মেঘমালার রূপের সঙ্গে কোথাও যেন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে হস্তির। 'যুদ্ধ, পরিবহন ও মৃগয়াদিতে' হস্তীর আভিজাত্যের কারণে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হওয়ার যোগ্যতা এই বিরাট বপু পশুটির আছে। বিজয় গুপ্ত লিখেছেন—"পারিজাত পুষ্পের মালা/ভরিয়া সকল গলা/ঐরাবতে চলে সুরপতি।।"

৯.

সর্পবাহন দেবতা

মৃত্তিকালগ্ন অশিক্ষিত মানুষ সর্পের বক্রগতির মধ্যে দেখেন দেবী মনসার প্রতিকৃতি। মনসামন্দিরে অনেক সময় বেদির উপরে দেবীর বাহন রূপে সর্পের প্রতীকী মূর্তি স্থাপন করা হয়। ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব।" ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক লিখেছেন, "দেবদেবীর চরিত্র, ধর্ম-গুণ-কর্ম প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁদের বাহনও যুক্ত।" হংসবাহন দেবী মনসার কথা উল্লেখ করে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—"পদ্মা বলে নেতা তুমি হও সাবধান।/এই সর্প দিয়া সাজাও রথখান।।/একে নেতা আর পদ্মার আজ্ঞা পায়ে।/পদ্মার সাক্ষাতে নেতা রথ সাজায়ে।।/নেতা রথ সাজায়ে দেখিতে সুন্দর।/নাগরথে পদ্মাবতী চলিল সত্বর।।"

১০.

দেবতার ঈর্ষাপরায়ণ স্ত্রী—পার্বতী

বিজয় গুপ্তের মনসা দেবসমাজ ও মানবসমাজের কোথাও সহজ স্বীকৃতি পাননি। চণ্ডী তাঁকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছেন। প্রহার করেছেন। অমানবিক আচরণ করেছেন তাঁর সঙ্গে। চণ্ডীর এই রণংদেহী ক্রুদ্ধস্বভাব তাঁর চরিত্রের ক্রূরতা ও জিঘাংসার পরিচয় বহন করে। 'মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার' শীর্ষক কাব্যাংশে চণ্ডীর দুর্ব্যবহার স্মরণীয়—"চুলে মুখে পেটে পিষ্টে মারে ঘারকাতা।/বিপরীত বোলে পদ্মা মনে লাগে বেথা॥/নিষ্ঠুর হইয়া মারে চণ্ডী প্রাণে সইতে নারে।/বাপ বাপ বলি পদ্মা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥" এখানে চণ্ডী সৎমায়ের ভূমিকায় থেকেছেন। আর মনসা লাঞ্ছিতা কন্যার ভূমিকায় উপনীত হয়েছেন। সংসারে মাতৃ বিয়োগ হলে পিতার পুনর্বিবাহে সন্তানের যে করুণ অবস্থা হয়; মনসা তারই দৃষ্টান্ত।

১১.

দুর্ভাগ্যের দেবতা

মনসা ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অসুখী। তাঁর চরিত্রগত এই দিকটি তাঁকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছে। অভীপ্সিত কর্ম সম্পাদনের অভিপ্রায়ে তিনি প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনাশ করেছেন। যেমন—

১. ধন্বন্তরিকে হত্যা করেছেন, ফলে চাঁদ বান্ধবহীন হয়েছেন।
২. চাঁদের গুয়াবাগান নষ্ট করেছেন, ফলে চাঁদের গৃহ সৌন্দর্যহীন হয়েছে।
৩. বাণিজ্যতরী নিমজ্জিত করেছেন, ফলে চাঁদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
৪. লখিন্দরসহ অন্য পুত্রদের প্রাণ নাশ করায়, তিনি সন্তানহীন হয়েছেন।

তাঁর চরিত্রের নেতিবাচক দিক থেকে তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, মনসামঙ্গল কাব্যধারায় তিনি দুর্ভাগ্যের দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন। ভাগ্য যেন তাঁর সঙ্গে নিরন্তর দুষ্টুমির খেলা করেছে। বাংলা লোকপুরাণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

এ ২১.১	নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তা
এ ১২৩.২.১.২	চতুর্মুখ দেবতা
এ ১২৩.৩.১.২	সহস্রলোচন দেবতা
এ ১২৩.৫.১	বহুভুজ দেবতা
এ ১২৪.১	অগ্নিলোচন দেবতা
এ ১৩১	পশু-আকৃতির দেবতা
এ ১৩২	পশুর রূপে দেবতা
এ ১৩৩	দানবরূপী দেবতা
এ ১৩৬.১.৩	বৃষবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৪.১	হংসবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৬	মহিষবাহন দেবতা
এ ১৩৬.১.৭	সিংহবাহন দেবতা
এ ১৫১	দেবতাদের আবাসবস্থল

এ ১৫১.৩	সাগরতলে দেবতার আবাসস্থল
এ ১৫১.৮	দুধসাগরে দেবতা
এ ১৫৫.৫	দেবহস্তী
এ ১৫৬.৫	দেবতার রথ
এ ১৬২	দেবতাদের মধ্যে বিরোধ
এ ১৬২.১	দেব-মানবে যুদ্ধ
এ ১৬৫.২	দেবদূত
এ ৪২১	সাগর-দেব
এ ৪২১.১	সাগর-দেবী
এ ৪২৫	নদী-দেব
এ ৪২৫.১	নদী-দেবী
এ ৪৫৪.১	আরোগ্যের দেবী
এ ৪৬২.১	রূপের দেবী
এ ৪৬৩	ভাগ্যদেবতা
এ ৪৬৪	ন্যায়ের দেবতা
এ ৪৭৩.১	সম্পদের দেবী
এ ৪৭৮.২	বসন্তরোগের দেবী
এ ৪৮২.১	দুর্ভাগ্যের দেবতা
এ ৪৮৭	মৃত্যুর দেবতা
এ ৪৮৮	ধ্বংসের দেবতা
এ ৬৬১	স্বর্গ
এ ৭৫১.৮.১	চাঁদে চরকা-কাটা বুড়ি
এ ১০০১.১	স্বর্ণযুগ

৭. গীতিকা

বাংলা সাহিত্যে তিন ধরনের গীতিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হলো—নাথ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা। এই গীতিকাগুলির মধ্যে ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর স্বাধিকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর স্পর্ধা অর্জিত হতে দেখা যায়। নারীর কোমলতা-কমনীয়তা-ব্যক্তিত্ব—সব মিলিয়ে ময়মনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা আমাদের কাছে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। স্টিথ টমসন এবং র‍্যালফ স্টিলবগস বাংলা গীতিকার মোটিফ ইনডেক্স অনুসারে যে তালিকা করেছেন, তা নিম্নরূপ—

সি ২০০	গীতিকা
সি ৩২০	ভাবাবেগ
সি ৩২২	প্রেম
সি ৩২৩	ঘৃণা
সি ৩২৪	আনন্দ
সি ৩২৫	বিষাদ

সি ৩২৬	প্রশংসা
সি ৩২৭	ভর্ৎসনা
সি ৩৩০	প্রাত্যহিক জীবন
সি ৩৩৪	ক্রিয়াশীলতা
সি ৩৩৬	সামাজিক মিলন
সি ৩৪০	জীবনের চরম মুহূর্ত
সি ৩৪২	জন্ম
সি ৩৪৫	বিবাহ
সি ৩৪৬	মৃত্যু
সি ৩৪৭	বিচ্ছেদ-বিরহ
সি ৩৬০	ছেলে-মেয়ে
সি ৩৬৬	দোলনার গান-ঘুমপাড়ানি গান
সি ৪২৪	দম্পতি
সি ৪২৬	গোষ্ঠী
সি ৪৩২	আরাধনা
সি ৪৩৪	জীবনবৃত্ত
সি ৪৩৬	উৎসব
সি ৪৮২	যন্ত্রাণুষঙ্গ
সি ৪৮৪	পোশাক
সি ৪৯০	নাটকীয়তা
সি ৫৩০	মানসিক ক্রিয়া

৩.

বাংলার ব্রত ও পার্বণ

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি মিশ্র প্রকৃতির। সংযম ও তপস্যা, জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং প্রত্যেকের মধ্যে পরমাত্মার আলো অনুসন্ধাই হিন্দুধর্মের প্রাণের কথা। সমদৃষ্টি ও সমপ্রাণতা এবং বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা করে হিন্দুধর্ম। বাংলার বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে উভয় বাংলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছে। ভাবপ্রবণ বাঙালি জাতি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার উদ্দেশ্যে ব্রত-উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ধর্মভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে ব্রতকথার মধ্যে এসব অনুষ্ঠানের উৎস নিহিত ছিল। অর্থাৎ প্রাক্-পুরাণ পর্ব থেকে লোকমুখে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক অংশগুলি উচ্চারিত হয়ে আসছিল। তাই মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ কথকতা, কীর্তন, মঙ্গল গান, মৌখিক ছড়ার মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতেন। বস্তুত, এই ব্রতের মধ্যে বঙ্গরমণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। আর্যদের চোখে যারা ব্রাত্য, অনার্য, অসুর ইত্যাদি নামে চিহ্নিত তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ, ব্রতাচার, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং কৃষিকেন্দ্রিক সমস্ত পালা-পার্বণকে পরবর্তী কালে আর্যভাষীরা গ্রহণ করেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় ল(

করেছেন—"বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যে সব ফল-মূল আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।" একটি জাতির বর্ণময় প্রাণসত্তার প্রকাশ পায় যে ব্রতের মধ্যে তার সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য—

> ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আল্পনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে, নৃত্যে, এককথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত, কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত বাসনা।

ব্রতকথা মূলত মেয়েদের 'সচল জীবন্ত বাসনা'। ব্রতে মন্ত্রের কোন স্থান নেই। এর মধ্যে রয়েছে যাদুবিদ্যাগত দিক। লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে লোকসমাজের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছাপ পরে তাদের আচার-অনুষ্ঠানে। কিন্তু ব্রত একান্তই ব্যক্তিগত প্রার্থনার ক্ষেত্র বলে লোকসংস্কৃতির বিশুদ্ধ রূপ সেখানে পাওয়া যায়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' নামাঙ্কিত গ্রন্থের ভূমিকায় একটি জাতির স্পন্দন কীভাবে ব্রতকথা থেকে লাভ করা যায় সে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> যে সকল কথা ও গান সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া রূপকথা ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

ব্রতকথার দেব-দেবী লৌকিক। লোককথার সুরারোপিত মৌখিক রূপ হল ব্রতকথা। ব্রতকথার গল্পগুলি কোনো অলৌকিক দেবতার কথায় উৎসাহী নয়। পুরাণানুসারী যেসব দেবী ব্রতকথায় স্থানলাভ করেন, তাঁদের নামটুকুমাত্র পৌরাণিক, বাকি সব বৈশিষ্ট্য লৌকিক। বাংলার লোকসাহিত্য সংগ্রহ, চর্চা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিদ্যাগত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার আদিগঙ্গা-ভগীরথ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ব্রতকথা' আলোচনায় লিখেছেন—

> ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে সকল দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে, তাঁহারা কেহই হিন্দু পুরাণোক্ত দেবদেবী নহেন। অনেক সময় তাঁহাদের নাম দেখিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু নামে কিছুই আসিয়া যায় না—দেবদেবীদিগের প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নামে নহে, তাঁহাদের আচরণে। অতএব লক্ষ্মী নাম দেখিলেই তিনি পৌরাণিক বিষ্ণুর সমুদ্রমন্থনোদ্ভবা পত্নী বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আদিম সমাজের সঙ্গে উচ্চতর সমাজের সংমিশ্রণের (fusion) ফলে সমাজের মধ্যে দেবতা সম্পর্কে অনিষ্টকারিণী শক্তির (malignant power) পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে একটি শুভঙ্করী (benevolent) শক্তির পরিকল্পনাও স্থান পাইয়াছিল। আর্য ও আর্যেতর সমাজের মিশ্রণের ফলে যে-সকল দেশে নূতন সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহাদেরই সমাবেশ হইয়াছে।

ব্রতকথার দেবতা প্রাত্যহিক জীবনের ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে পারেন। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মত তিনি মঙ্গলকারিনী আবার প্রতিহিংসাপরায়ণা। এই দেবতার শক্তি 'ঐহিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ'। এঁদের কার্যকলাপের মধ্যে মনুষ্য আচরণ পরিস্ফুট। দেবতা ও মানুষে কোন পার্থক্য এখানে নেই। মানুষের মঙ্গলের জন্যে এখানে দেবতার কল্পনা ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই ব্রতকথা মন্ত্র-তন্ত্র-জাঁকজমকহীন অতি সাধারণ পূজাচার। মঙ্গলকাব্যের দেবতার সঙ্গে ব্রতকথার দেবতার সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রচনায় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন—

> ব্রতকথার দেবতাদিগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের ভাবগত সম্পর্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথা ভিত্তি করিয়াই উচ্চতর সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে।[৫৫]

একথা বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না, ব্রতকথার প্রসারিত কাহিনি সম্বলিত রূপ হল আখ্যানধর্মী মঙ্গলকাব্য। লোকসমাজ থেকে সূত্র সংগ্রহ করেছে ব্রত এবং ব্রত শেষাবধি সুগঠিত আঙ্গিকের বাঁধনে রূপ পেয়েছে মঙ্গলকাব্যে। লোককথার সঙ্গে ব্রতের সাদৃশ্য এখানে যে, লোককথা থেকে ব্রতকথার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। ফলে ব্রতকথার মধ্যে রয়েছে নির্ভেজাল সরলতা। 'ব্রত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এমন—

১. প্রার্থনা করা।
২. নিয়ম ও সংযম রক্ষা করা।
৩. নিয়মবিহিত ধর্ম-কর্ম পালন করা।

পুনশ্চ, বেদব্রত সম্পর্কে উদাসীন বা অজ্ঞানীদের বলা হত ব্রাত্য। কখনও সংস্কারহীন পতিত 'ব্রাত্য' রূপে চিহ্নিত হয়ে নিন্দিত হত আর্যদের চোখে। দশ সংস্কার মানেন না যিনি তিনিই ব্রাত্য। 'ব্রত' অর্থে শাস্ত্রবিহিত নিয়ম বোঝায় ঋগ্বেদে। সহজ কথায়, 'ব্রতচ্যুতই হল ব্রাত্য'। প্রচলিত ব্রতকথাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১. কুমারী ব্রত : পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, সেঁজুতি, তুষ-তুষলি, মাঘমণ্ডল, বসুধারা, দশপুতুল, শিবব্রত।
২. সধবা ব্রত : ষষ্ঠী, সাবিত্রী, কোজাগরী, লক্ষ্মীপুজো, শিবরাত্রি, মঙ্গলচণ্ডী, ইতু।
৩. বিধবা ব্রত : অম্বুবাচী, একাদশী, অরণ্য ষষ্ঠী, সংকটতারিণী, তাল নবমী।

প্রাক্‌বৈদিক জনগণের মধ্যে ব্রতের প্রচলন ছিল এবং তারা নিয়মিত নানা ব্রত পালন করতেন। এসব ব্রতাচার বৈদিক আর্যদের পূজা পদ্ধতির থেকে একেবারেই পৃথক। বাঙালির লৌকিক সংস্কৃতিতে প্রাক্-আর্য এইসব ব্রতকথার প্রভাব অনেকখানি। আট থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত কোনো না কোনো ব্রত মেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। এগুলি শাস্ত্র বহির্ভূত লৌকিক স্ত্রী আচার। ব্রতের জন্মকথা জানাতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—

> ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন। তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতে সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই।... ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া ব্রতস্থান নির্বাচন করিয়া লওয়া হয়; এই সীমারেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন।... এই ম্যাজিক-বিশ্বাসী ব্রতচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধ হয় ছিলেন ব্রাত্য।

ব্রতের সঙ্গে যাদুশক্তির সম্পর্ক অবশ্য বাধ্যতামূলক নয়। কল্পনা, বিশ্বাস, সংস্কার, কামনা, বাসনার একত্রিত সমাবেশ হল ব্রত। ব্রত বাসনা চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। পূরণ করে পার্থিব কামনা। যে বক্তব্য কখনও অপরের কাছে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব নয়, নারীর একান্ত সেই কামনাও ব্রতের দেবতা শোনেন। পূরণ করেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। সমাজ বিরূপ হলেও ব্রতের দেবতা বিরূপ হল না, এটাই সুবিধা। তবে ব্রত পালনে বিঘ্ন হলে দেবতা অখুশী হন। তখন পুণ্যলাভ তো দূরের কথা, অনিষ্ট আশঙ্কা হয় প্রবল। এমনকি রুষ্ট দেবতার প্রকোপে দারিদ্র্য হয় প্রকট। স্বামী-পুত্র হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এই ক্ষতি আর্থিক, শারীরিক এমনকি মানসিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে পুনরায় ব্রত পালন করা আবশ্যক। দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা, মানত করা, কঠিন সংযম রক্ষা করা বাধ্যতামূলক। পরিণামে ব্রতের দেবতা খুশি হলে ব্রতপালনকারিণীর হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও সমুদয় বিঘ্ন অপসারণ হয়। ব্রতের মূল লক্ষ্য প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা। ফলে এখানে অনাবিল প্রশান্তি, স্নেহ-প্রেম-মমতা, উদ্বেগ-আকুলতা থেকে বিশেষ কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রত পালন করা হয়। এমন কোনো মাস নেই যে ব্রত-পার্বণ পালন করা হয় না। অতি প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ বধূর মনে ব্রত পালনের ইচ্ছা সংগুপ্ত থাকত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

১. ব্রতের জন্মকথা অতি প্রাচীন। 'স্মরণাতীত কাল' থেকে চলে আসছে ব্রতানুষ্ঠান।
২. ব্রতের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষ থাকে প্রচ্ছন্ন।
৩. ব্রতের 'কথা' গুলি হল অতীতের 'অলিখিত ইতিহাস'। এদিক থেকে এর গুরুত্ব তুল্যমূল্য।
৪. ব্রতের মধ্যে থাকে 'অনাবিল সৌন্দর্যের ছবি'।
৫. ব্রতের যে আখ্যান বা 'কথা', তার ভাষা আদিম ও আন্তরিক। সে ভাষা অলংকারবিলাস বিহীন। এজন্যে তা ঐতিহ্যবাহী।
৬. ব্রতকথায় দেখা যায়, দেবীমূর্তির অন্তরালে অবস্থান করে মানবীমূর্তি।
৭. ব্রতের লক্ষ্য গৃহকল্যাণ। নষ্টসম্পদ উদ্ধার কিংবা পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি প্রত্যাশা।
৮. কখনও বা রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করে 'লক্ষ্মৈশ্বর্যে গরীয়সী' হওয়া ব্রতকারিণীর উদ্দেশ্য।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয়ে লিখেছেন—"নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য কামনায়, সৌভাগ্য কামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করেছে, কি আর্য, কি 'অন্য ব্রত' সব দলেই। এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।"

৩.১ পুণ্যিপুকুর

বৃষ্টির জন্যে ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এই রীতি মূলত জনজাতি সংস্কৃতি সংজ্ঞাত। এই ব্রত মূলত বৃষ্টিকামনা বিষয়ক। বাংলাদেশে মেঘরানির ব্রত পালন করা হয় একই উদ্দেশ্যে।

এমনকি বসুধরা ব্রতের উদ্দেশ্যও তাই। বৈশাখ মাসে এই ব্রত পালন করা হয়। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত করিয়ে পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলা রূপদান করাই এই ব্রতের মূল লক্ষ্য। এই ব্রতের সঙ্গে যুক্ত থাকে ঐশ্বর্য কামনা। এই ব্রত একান্তই লৌকিক ব্রত। পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন এখানে নেই। ব্রতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছড়া। এই ছড়াগুলি আসলে অনুষ্ঠানের মন্ত্রস্বরূপ। নারী তার মনের কামনার প্রকাশ হিসেবে এই ছড়া আবৃত্তি করে থাকে। এমন একটি ছড়া হলো—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজে গো দুপুরবেলা
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে
মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গাজলে।

পুণ্যিপুকুর ব্রত কুমারী ব্রত। কুমারীরা এই ব্রত ছাড়া মাঘমণ্ডল, শিব ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, তুষ-তুষলি ব্রত পালন করে থাকে। এই ব্রতের কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। একটি ছোটো গর্ত করে তার চারপাশে চারটি ঘর স্থাপন করতে হয়। এই চারটি ঘরে থাকে—একটি শাঁখ, একটি চন্দনকাঠ, একটি সুপারি ও একটি সিঁদুর কৌটো। পুকুরের মাঝখানে একটি তুলসী গাছের সঙ্গে একটি বেল গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়। এরপরেই মেয়েরা ছড়া কাটতে থাকে। এই ব্রতের বৈশিষ্ট্য হলো—

১. এই ব্রতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া মূলত একটি পুকুরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয়। এই ব্রতটি ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টিপাত করিয়ে পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলা করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই পালিত হয়।
২. কুমারী ও সধবা নারীরা তাদের কামনা-বাসনা প্রকাশ করে ছড়ার মাধ্যমে। প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় এই ব্রতের ছড়া আবৃত্তি করে ব্রতটি পালন করা হয়। ব্রতের ছড়ায় বলা হয়, যে এই ব্রত পালন করে তার ধন-সম্পদ-সার্বিক সমৃদ্ধি হয়।
৩. ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হলো—প্রবল দাবদাহের হাত থেকে সজীব-সতেজ গাছপালাগুলিকে বাঁচানো। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড গরমে যাতে জল শুকিয়ে না যায় এবং ফসল নষ্ট না হয়, সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে এই ব্রত পালন করা হয়।
৪. প্রত্যেকটা ব্রতের মধ্যে থাকে একটি গল্প। সেই গল্পের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই থাকে। এই গল্পের মধ্যে রয়েছে এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর আশীর্বাদ প্রাপ্তি।
৫. প্রত্যেক ব্রতের শেষে দেখা যায় অলৌকিক ক্ষমতাশালী কেউ এসে অভূতপূর্ব কোনো অসাধ্য বিষয় সাধন করে দিচ্ছেন।
৬. পুণ্যিপুকুর ব্রতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে বুদ্ধবেশী নারায়ণ পূজারিণীকে আশীর্বাদ করেন, পূজারিণীর পুণ্যিপুকুর ব্রত সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, প্রভাতেই তার দুঃখ দূর হবে।
৭. ব্রতের শেষে অসম্ভব সম্ভবপর ঘটনা সম্পন্ন হয়। এই ব্রতে দেখা যায় স্বয়ং রাজা তাঁর ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ দেওয়ার সংকল্প করেছেন। অর্থাৎ ব্রত

সংকল্পকারিণী নারায়ণের ইচ্ছায় অসাধ্যসাধন করেছে।

৮. ব্রত শেষে ব্রতের মাহাত্ম্যকথা চারিদিকে কীর্তিত হয়। এই ব্রতের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের পারস্পরিক বিরোধ অবসিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে ব্রত করার ফলে ব্রতকারিণী রাজৈশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েছে। সেই থেকে পুণ্যিপুকুরের ব্রত চারিদিকে প্রচারিত হয়েছে।[৩০]

৯. পাশাপাশি এটাও দেখার যে, লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে এই ব্রত করার ফলে প্রকৃতি তার রুদ্র রূপ পরিত্যাগ করে অবশেষে শুভঙ্করী সত্তায় আত্মপ্রকাশ করেন।

১০. গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদহের হাত থেকে খাল-বিল-নদ-নদী-পুকুরের জল যাতে শুকিয়ে না যায়, সেই সংকল্প থেকে এই ব্রত পালিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একদিকে সামগ্রিক মঙ্গল ও পাশাপাশি বৃষ্টির আবাহন কামনায় নারীরা এই ব্রত পালন করে থাকে। এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয়। পুরো বৈশাখ মাস ধরে এই ব্রত পালন করা হয়। রাঢ় অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত পালিত এই ব্রতের মূলে রয়েছে বৃষ্টি কামনা। মূলত বাঁকুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় এই ব্রতের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

৩.২ মাঘমণ্ডল

আদিম প্রভাবজাত উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে নানারকম জাদুক্রিয়ার প্রচলন লক্ষণীয়। এই জাদু ক্রিয়ার সঙ্গে নানারকম আচার-বিচার প্রথার গভীর সংযোগ রয়েছে। এই ব্রতের সঙ্গে শস্য-উর্বরতা-কৃষি-জাদু শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। সৌর জগতের সঙ্গেও এই ব্রতের সম্পর্ক সূত্র নির্দেশ করা হয়। মাঘ মাসে এই ব্রত পালন করা হয়। সূর্যের সঙ্গে এই ব্রতের গভীর সক্ষতা রয়েছে। বস্তুত এই ব্রতের সঙ্গে সূর্যের উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মাঘ মাসে গৃহের প্রাঙ্গনে আলপনা এঁকে এই ব্রত পালন করা হয়। মাঘ মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরে এই ব্রত পালন করে মেয়েরা। সূর্য ওঠার আগে তার স্নান করে শুদ্ধ কাপড় পড়ে দলবদ্ধভাবে পুকুর ঘাটে যায়। সূর্যের উদ্দেশ্যে তারা মন্ত্র উচ্চারণ করে। সেই মন্ত্র কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতের উচ্চারিত দুর্বোধ্য মন্ত্র নয়। এই মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে সহজ-সরল গ্রাম বাংলার ব্রতবাসিনী মেয়েদের নিজস্ব সুর ও স্বর। একটি করে ফুল সূর্যের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। আর তার সঙ্গে চলে সুরের আবাহন। এই ব্রতের মধ্যে থাকে কৃষিকাজের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। এই ব্রতের কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো—

১. অবিবাহিতা মেয়েরা এই ব্রত পালন করে মনের মতো পতিপ্রাপ্তির কামনায়।

২. পরিবারের মঙ্গলকামনাতেও এই ব্রত পালন করা হয়।

৩. এই ব্রতের মধ্যে থাকে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের লোকবিশ্বাস।

৪. ব্রতের আলপনায় সূর্য-চন্দ্র-তারা-পৃথিবী ইত্যাদির ছবি আঁকা হয়।

৫. ব্রতের মধ্যে ধরা পড়ে আদি বৃক্ষ উপাসনা। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় সূর্যোপাসনা। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। ফলে ব্রতের মধ্যে পৃথিবীর উপাসনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পায়।

৬. এই ব্রতের সঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে।

৭. শস্য সংক্রান্ত জাদুক্রিয়া মাঘমণ্ডল ব্রতের মধ্যে দেখা যায়।

৮. সূর্য ছাড়া জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই সূর্যোকেই ব্রতবাসিনীরা সশ্রদ্ধ প্রণতী জ্ঞাপন করে।

৯. এই ব্রত পালনের নিজস্ব কতকগুলি নিয়মাচার রয়েছে। যেমন—পুকুরের স্নান ঘাটে কলাগাছ পুতে তার গোড়ায় আম্রপল্লবসহ মাটির ঘট বসাতে হয়। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন পুরোহিত পুকুরের ধারে খোলা জায়গায় পুজো করেন। এই সময় ব্রতীরা এভাবে ছড়া উচ্চারণ করেন—

আউলে মাঘে শ্রীদুর্গার আগে
শ্রীদুর্গা জল না ছুইতে আমরা ছুইছি আগে।
আউগে মাঘে সইষ্য ফুলের আগে
সইষ্য ফুলে জল না ছুইতে আমরা ছুইছি আগে।

ড. শীলা বসাক 'বাংলার ব্রতপার্বণ' নামাঙ্কিত গ্রন্থে লিখেছেন, "মাঘমণ্ডল ব্রত আসলে সূর্যপূজা। সূর্যের রশ্মিতে সব জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।" অর্থাৎ এই ব্রতের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক রয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ত্রিপুরার কোনো কোনো অঞ্চলে এই ব্রত পালন করা হয়। আবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে এই ব্রত পালন করা হয়। কুমিল্লা জেলায় দেখা যায়, "ব্রতের দিন ব্রতিনী স্নান করে শুচি বস্ত্রে পিটুলি, তুষ, ইঁটের গুঁড়ো, আবির ইত্যাদি মিশিয়ে একপ্রকার রং তৈরি করে তা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে পৃথিবী অর্থাৎ একটি গোলাকার বৃত্ত অঙ্কন করে। বৃত্তের পূর্ব দিকে সূর্য এবং পশ্চিমদিকে চন্দ্রের চিত্র আঁকা হয় এবং বৃত্তের ভিতরে মানুষের মূর্তি অঙ্কন করা হয়।"[৩১]

৩.৩ সেঁজুতি ব্রত

সেঁজুতি ব্রত হলো কুমারী ব্রত। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ির প্রাঙ্গণে আলপনা দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা। ব্রতের আলপনায় ও ছড়ায় কুমারী মনের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। এই ব্রত একেবারেই অশাস্ত্রীয় ব্রত। কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। কোনো মন্ত্রের অনুশাসন নেই। তিনটি পর্যায়ে এই ব্রত পালন করা হয়। বিষয়টি এমন—

- প্রথম পর্যায়ে ব্রত পালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্থাৎ একটি কলসি, পিটুলি, দুর্বাঘাস, প্রদীপ, ধুপ ও একটি জলে পরিপূর্ণ ঘট সংগ্রহ করা হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে আলপনা আঁকা হয়। সেই আলপনার মধ্যে কুমারী মনের বাসনা এবং তার প্রার্থনা সুচিত্রিত হয়।
- তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিটি লেখাচিত্রের উপর একটি করে দুর্বা দিয়ে মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে ছড়া আবৃত্তি করা হয়।

সেঁজুতি ব্রতের ছড়ায় ব্রতিনীর বাসনা প্রকাশিত হয় যথাযথ শিল্পীত ছড়ার বাঁধনে—

কোঁড়ার মাথায় দিয়ে ঘি
আমি হই রাজার ঝি।

কোঁড়ার মাথায় দিয়ে মৌ
আমি হই বাজার বৌ।
কোঁড়ার মাথায় দিয়ে ফাগ
আমি হই রাজার মাগ।

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, ব্রত মূলত নারীর বাসনার বহিঃপ্রকাশ। কল্পনা, বিশ্বাস, জাদু, স্বপ্ন, বাস্তবতা, প্রতীক, চিত্র, রেখা, কথন ইত্যাদির সমন্বয় হলো ব্রত। বাঙালির আচার-বিচার-উপাচার বিচার করলে দেখা যায়, এই ব্রতগুলির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পরিবার কল্যাণ ও সমাজকল্যাণ। দেশাচার ও কুলাচার এই ব্রতের সঙ্গে যুক্ত। ব্রতের সব ছড়াতেই সুখ-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য আর শত্রু বিনাশের কামনা আছে। ব্রতের চতুরঙ্গ উপাদান লক্ষণীয়। যথা—আচার, আলপনা, ছড়া বা মন্ত্র ও কথা। ব্রত দুই প্রকার—শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। এই ব্রতের মধ্যে রয়েছে প্রাচীনতার স্বাক্ষর। ব্রতের মধ্যে বাঙালির আদিমতা ও বাঙালির অন্দরমহলের ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায় অনায়াসে।

উৎসের সন্ধানে

১. Herslovites, Melville j, 1966, Cultural Dynamics, New York, Alfred A. Kropf. P. 4.
২. পবিত্র সরকার। লোকভাষা : লোকসংস্কৃতি। ১৯৯৭, পৃ ১১।
৩. Kluckhohn, Mirror for Man, Greenwich, Conn, Fawcett Publications, Inc. p-42.
৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত শিল্প ইতিহাস, পৃ. ৬।
৫. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে। পৃ. ৪৫৮।
৬. জ্যোর্তিময় ঘোষ। রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক। দে'জ। জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৬২।
৭. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত : ভারত-সংস্কৃতির রূপরেখা। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, ১ জানুয়ারি, ২০০৩। পৃ. ২১৪।
৮. সাক্ষাৎ : সুকুমার সরকার। পিতা—বনমালী সরকার। গ্রাম—শিবতলা। ডাকঘর—হৃদয়পুর। থানা—বারাসত। কল—৭০০ ১২৭। সম্প্রদায়—নমঃশূদ্র। পেশা—কৃষিকাজ। সাক্ষাতের তাং-৩১শে চৈত্র ১৪১১।
৯. Encyclopaedia Britanicca. Vol. IV, 1929, P. 444.
১০. Gouri Prasad Ghose : Everyman's Dictionary, Ramakrishna Pustakalaya, September 20001, P. 664.
১১. Charles Wirck : Dictionary of Anthropology 1956, U.S.A. p. 217.
১২. International Dictonary of Regional European Ethnology and Folklore, Vol-1, 1960, p-126.
১৩. Devid E Hunter and Phillip Whiten : Encyclopaedia of Anthropology, U.S.A., 1976, P. 173.
১৪. ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় : লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা। দে'জ, কলকাতা। বৈশাখ, ১৪০৮। পৃ. ৪৩-৪৪।

১৫. প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত। 'গণকণ্ঠ' পত্রিকা, ১৯৮৫, "লোকসংস্কৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ. ৪০।
১৬. সাক্ষাৎ : মানিক সিংহ। প্রযত্নে—বিশ্বেশ্বর সিংহ। গ্রাম-চারঘাট। ডাকঘর—চারঘাট। থানা—স্বরপনগর। জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা। সম্প্রদায়—রাজবংশী। পেশা—মৎস্য শিকার। সাক্ষাতের তারিখ—১২-০২-২০০২।
১৭. সাক্ষাৎ : বলাই মণ্ডল। প্রযত্নে—কানাই মণ্ডল। গ্রাম—চারঘাট। ডাকঘর—চারঘাট। থানা—স্বরপনগর। জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা। সম্প্রদায়—পৌণ্ড্রক্ষত্রীয়। পেশা—চাষাবাদ। সাক্ষাতের তারিখ—১২-০২-২০০২।
১৮. Elman R. Service : Profiles in Ethonologies, 1971, U.S.A., P. 170.
১৯. ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়। লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা। দে'জ, কলকাতা। বৈশাখ ১৪০৮, পৃ. ৪০।
২০. G. P. Kurath : S D. F. L., P. 40.
২১. United Nations Educational Scientific & Cultural Organisation, Paris, 1984.
২২. Mac Edward Leach : The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, Vol. I, P-401.
২৩. Archar Tylor : Folklore and the students of literature, volume 2, Pacific spectator, 1948, P. 216.
২৪. দুলাল চৌধুরী। বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি। লোকায়ত প্রকাশনী, কলকাতা। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।
২৫. মযহারুল ইসলাম। লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০।
২৬. তুষার চট্টোপাধ্যায়। লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান। এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ। ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৬।
২৭. বাঁকুড়ার সভায় ভাষণ। ফাল্গুন, ১৮, ১৩৪৬।
২৮. শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক উৎসবে ভাষণ। চৈত্র, ১৩৩৭।
২৯. লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, পৃ. ৯২।
৩০. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোকসাহিত্য', ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ১৬৬-১৬৮
৩১. ড. শীলা বসাক : 'বাংলার ব্রত পার্বণ', পুস্তক বিপণি, মে ১৯৯৮, পৃ. ৪১৪